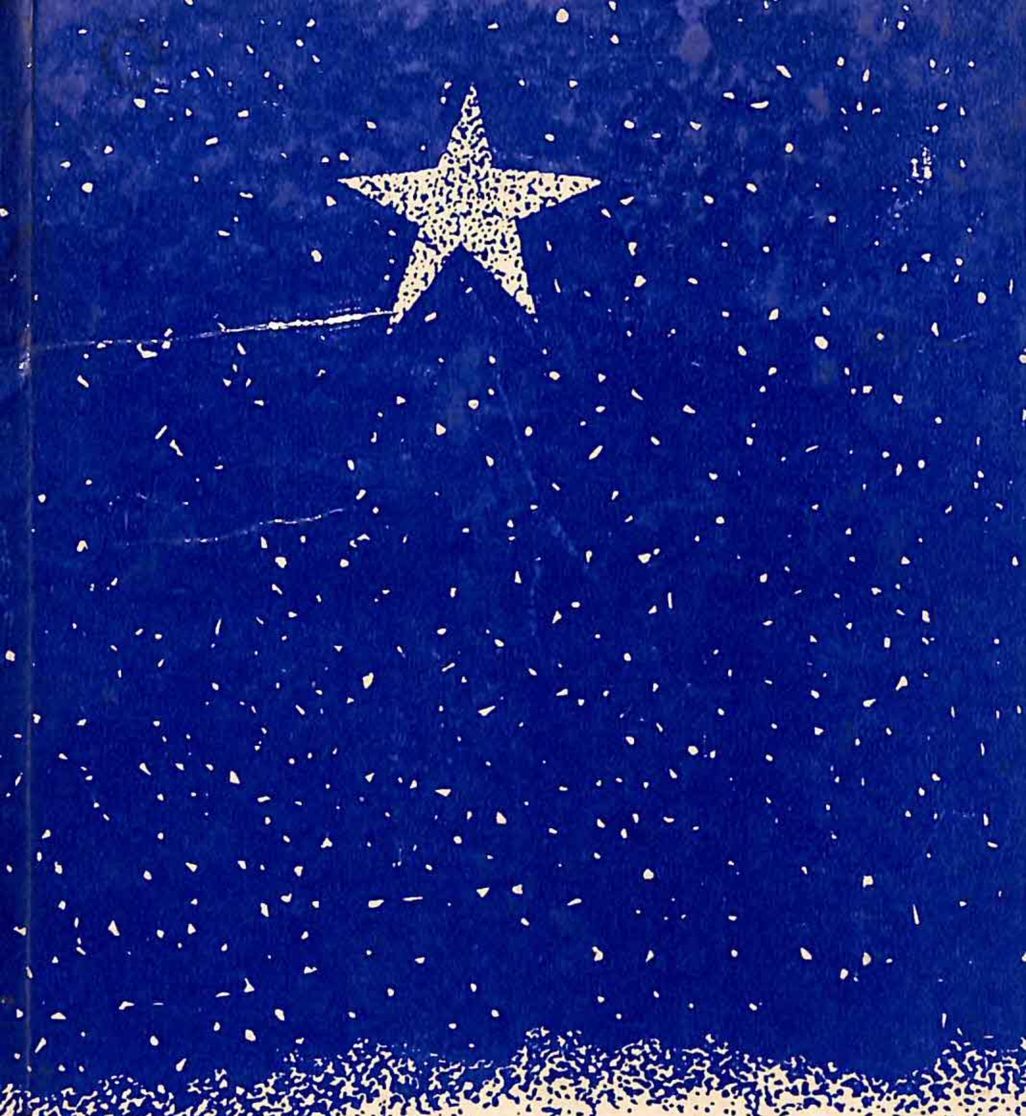


অজানা তারার সন্ধানে

নারায়ণ চক্রবর্তী

অজানা তারার সন্ধানে

(মৌলিক সায়েন্স ফিক্‌শান)

নারায়ণ চক্রবর্ত্তী

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম (নাথ পাবলিশিং) সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৯
মে ১৯৮২

দ্বিতীয় মুদ্রণ
বৈশাখ ১৩৯২
এপ্রিল ১৯৮৫

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬বি, পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ৭০০০২৯

প্রচ্ছদ
খালেদ চৌধুরী

মুদ্রক
প্রফুল্লকুমার বক্সী
জয়দুর্গা প্রেস
৫৩ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০০৯

২৫ টাকা

লেখকদের দরদী বন্ধু
শ্রীফণিভূষণ দেব
শ্রদ্ধাস্পদেষু

২৫৭০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস।

টেরাডেলফিউগোর বিশাল অবজারভেটারীর প্রকাণ্ড কনট্রোল রুমে বসে একমনে কাজ করছিলেন তরুণ বিজ্ঞানী ডক্টর পিয়ের লোটি। কনট্রোল বোর্ডটি বিরাট, অর্ধ-চন্দ্রাকার। তার প্যানেল জুড়ে অসংখ্য সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ভুল গাণিতিক নিয়মে কাজ করে যাচ্ছিল। লাল নীল হলদে সবুজ নব্‌গুলি নিঃশব্দ দ্যুতি বিকিরণ করছিল। একপাশে কয়েক ধরনের শক্তিশালী ইলেক্ট্রনিক টেলিভিসোস্কোপ নিঃশব্দে মহাকাশের অজানা তথ্য আহরণ করছিল। গ্যালাক্সির দূর প্রান্তে, পৃথিবী থেকে দশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে একটি নতুন তারা জন্ম নিচ্ছিল, স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক টেলিভিসোস্কোপগুলো তারই জন্ম রহস্যের অবগুণ্ঠন খুলে দেখছিল। নিবিড় পর্যবেক্ষণের ফলাফলগুলি সাঙ্কেতিক রেখা-বিন্দুর ভাষায় ফুটে উঠেছিল স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের গর্ভে থাকা সেলুনিয়াম বোর্ডে। পরে ওগুলো মাইক্রোফিল্‌মে রূপান্তরিত হ'য়ে গ্রহমণ্ডল সরকারের কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান গবেষণাগারে পৌঁছে যাবে। বিচার বিশ্লেষণের পরে ফলাফলগুলো ছড়িয়ে পড়বে সৌরজগতের জীব-অধ্যুষিত গ্রহগুলিতে।

উজ্জ্বল, ঝকঝকে, সুন্দর রাত। আকাশে প্রকাণ্ড কৃত্রিম চাঁদ। প্রফুল্ল মনে একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে কাজ করছিলেন ডক্টর পিয়ের লোটি। টাহিটি থেকে ডক্টর রেখা সোম আবার ফিরে আসছে টেরাডেলফিউগোর অবজারভেটারীতে। উচ্ছল রেখা সোম উদ্বেলিত যৌবনা, জ্ঞানতাপস পিয়ের লোটির মনে ঝড় তুলেছিল সে। রেখা সোমের উজ্জ্বল ঝকঝকে মুখখানা ভেসে উঠলো পিয়ের লোটির চোখের সামনে, কয়েকটি দিনের ও রাতের মধুর স্মৃতিতে উন্মনা হয়ে গেল তাঁর মন। সেই রেখা সোম আবার আসছে তাঁর সহকর্মিণী হয়ে···

হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ ধাতব শব্দ শুনে চমকে উঠলেন ডক্টর পিয়ের লোটি, চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল, ছুটে গেলেন স্বয়ংক্রিয় স্টেরিওগ্রাফের কাছে। কয়েকটা বোতাম টিপে দিয়ে কান ঢাকা টুপির মতো একটা যন্ত্র তুলে নিয়ে মাথায় চাপালেন। নাঃ, কোনো সন্দেহই নেই। গভীর মহাকাশ থেকে আবার সেই সঙ্কেতটাই আসছে। গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনতে লাগলেন তিনি ঃ ব্রিন্ ব্রিন্ ব্রিন্···পিন্ পিন্···ক্রা ক্রা···ট্রা ট্রা···ভ্যাস্ ভ্যাস্···হোয়াশ....

কনট্রোল বোর্ডের রিসিভিং সেক্টারের দিকে তাকালেন ডক্টর পিয়ের লোটি। লক্ষ্য করলেন যে সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক রিসিভিং মেশিনটি নিখুঁত ভাবে সঙ্কেতগুলো ধরে রাখছে, মাইক্রোটেপে রেকর্ড করছে।

উত্তেজনায় ডক্টর পিয়ের লোটির কপালের দু'পাশের নীল শিরা দুটো দপদপ করতে লাগল, তাড়াতাড়ি ইলেকট্রনিক টেলিভিসোস্কোপের তীব্র সন্ধানী চোখ গভীর মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ল। এখানে আর কিছু করবার নেই, তাই ছুটে রেকর্ড রুমে চলে গেলেন ডক্টর পিয়ের লোটি, রেকর্ড বুক খুলে পাতা ওলটাতে লাগলেন নিবিষ্ট মনে।

এর আগেও দু'বার শোনা গিয়েছিল এই অদ্ভুত সঙ্কেত। তবে সেগুলো ছিল খুবই ক্ষণস্থায়ী, এবারকার মতো দীর্ঘস্থায়ী ছিল না তারা। পাতা ওলটাতে ওলটাতে তারিখগুলো পেয়ে গেলেন ডক্টর পিয়ের লোটি, পাশের মার্জিনে টেরাডেলফিউগো অবজারভেটারীর ডিরেক্টার জেনারেল ডক্টর ভাবমূর্তি গুণবর্ধনের মন্তব্যও লেখা ছিল। এর আগে অনেকবারই পড়েছেন, তবু ঝুঁকে বসে আবার পড়তে লাগলেন ডক্টর পিয়ের লোটি।

'৩রা জানুয়ারী, ২৫৬৭ খৃষ্টাব্দ। সকাল সাতটা। গভীর মহাকাশ থেকে আসা একটি অজানা সঙ্কেত আমাদের অবজারভেটারীর স্টেরিওগ্রাফ মেশিনে ধরা পড়েছে। মাইক্রোটেপটি ইলেকট্রনিক কম্পিউটারে ফীড করে সঙ্কেতের অর্থ জানবার চেষ্টা করলাম আমরা। আমাদের কম্পিউটার ব্যর্থ হ'ল। মাইক্রোটেপটি রকেট যোগে গ্রহমণ্ডল সরকারের প্রধান বিজ্ঞান গবেষণাগারে পাঠানো হ'ল। কিন্তু

পৃথিবীর বা সৌরমণ্ডলের অন্য কোনো গ্রহের ভাষার সঙ্গে এই সঙ্কেতের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া গেল না, তাই সঙ্কেতের পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। তবে সঙ্কেতের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে এটুকু জানা গিয়েছিল যে আমাদের গ্যালাক্সির পনেরো হাজার কোটি তারার মধ্যে কোনো একটা তারা থেকেই সঙ্কেতটা এসেছে। কিন্তু এক লক্ষ আলোকবর্ষ বিস্তৃত এই বিশাল গ্যালাক্সির ঠিক কোন অঞ্চল থেকে সঙ্কেতটা এসেছে তা আমাদের প্রধান গবেষণাগারের সেরা কম্পিউটার মেশিনও বলতে পারে নি। ভবিষ্যতে এই সঙ্কেত আবার পাওয়া গেলে আবার তার উৎস খুঁজে দেখা হবে।'

ডক্টর গুণবর্ধনের মন্তব্যটুকু পরিপাক ক'রে আবার পাতা ওলটাতে লাগলেন ডক্টর পিয়ের লোটি। একটা পাতায় এসে থেমে গেলেন। আবার ডক্টর গুণবর্ধনের পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য :—

'১৭ই অগাষ্ট, ২৫৬৯ খৃষ্টাব্দ। দুপুর দুটো। গভীর মহাকাশ থেকে আবার একটি ক্ষণস্থায়ী সঙ্কেত এসেছে। ব্রিম্ ব্রিন্···পিন্ পিন্···ক্রা ট্রা···ভ্যাস্···হোয়াশ···। আমাদের নতুন টেলিভিসোস্কোপ এই সংকেতের উৎস সম্পর্কে নতুন তথ্য জানিয়েছে। যুগ্ম তারা ক্রুগার-৬০ এর কাছাকাছি কোনো তারা থেকেই এই অজানা সঙ্কেতটা এসেছে। অজানা লিখছে এই জন্য যে এবারও গ্রহমণ্ডল সরকারের প্রধান বিজ্ঞান গবেষণাগার এই সঙ্কেতের মর্মোদ্ধার করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ কাম্পা বর্তমানে একটি নতুন ধরনের কম্পিউটার তৈরী করবার কাজে উঠে পড়ে লেগেছেন। আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে ঐ কাম্পা কম্পিউটারই এই সঙ্কেতের মর্মোদ্ঘাটন করতে পারবে।

রেকর্ড বুক তুলে রেখে কনট্রোল রুমে এলেন ডক্টর পিয়ের লোটি। ইলেকট্রনিক। টেলিভিসোস্কোপটা সঙ্কেতের উৎস সন্ধানে গভীর মহাকাশে তার সন্ধানী চোখ মেলেছিল। যুগ্মতারা ক্রুগার-৬০-কে ছাড়িয়েও আরও দূরে ছড়িয়ে পড়েছিল তার দৃষ্টি। নির্ভুল যান্ত্রিক

কুশলতার সঙ্গে খুঁজে পেয়েছিল তার লক্ষ্য বস্তুটিকে। স্বয়ংক্রিয় মাইক্রোফিল্মে ফটো উঠছিল বিভিন্ন ফিলটারে। কয়েক মিনিট সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন পিয়ের. লোটি, তারপর কনট্রোল রুমের পূর্বদিকের দেওয়ালের কাছে গিয়ে একটি ফোম চেয়ারে বসলেন। সামনের প্যানেলে একটি ঘন সবুজ রং-এর নব্ লাগানো ছিল, আঙ্গুল তুলে নবের গায়ে একটু চাপ দিলেন তিনি, সঙ্গে সঙ্গে দেওয়ালের একটি অংশ অদৃশ্য হয়ে গেল, সেখানে ভেসে উঠলো একটি গোলাপী রং-এর স্ক্রীন. সেই স্ক্রীনে ১০০৫ তলার অফিসে বসা অবজারভেটারীর ডিরেক্টার জেনারেল ডক্টর ভাবমূর্তি গুণবর্ধনের চেহারা ভেসে উঠলো। বিরলকেশ প্রৌঢ় প্রাজ্ঞ ডক্টর গুণবর্ধন একটু হেসে বললেন,—'কি ব্যাপার ? এত উত্তেজিত হয়েছ কেন পিয়ের লোটি ?'

দ্রুতকণ্ঠে পিয়ের লোটি বললেন,—'আবার সেই রহস্যময় সঙ্কেত এসেছে স্যার। এবারের সঙ্কেতটা বেশ লম্বা ছিল, তাই তার উৎসেরও খোঁজ পাওয়া গেছে।'

সৌম্যদর্শন ডক্টর গুণবর্ধনের মানসিক প্রশান্তি মুহূর্তের মধ্যে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল, উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, বললেন,—'বলো কি ? কখন ?'

'এই মাত্র স্যার, এবার বোধ হয় সঙ্কেত-রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে।' ঘাড় কাৎ করে পিয়ের লোটির কথায় সায় দিয়ে ডক্টর গুণবর্ধন বললেন।

—'বিজ্ঞানীশ্রেষ্ঠ কাম্পার উদ্ভাবিত কাম্পা কমপিউটারটা আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আশা করছি যে ঐ কমপিউটারটা এই সঙ্কেতের মর্মোদ্ঘাটন করতে পারবে। তুমি কোথাও যেও না এখন, আমরা এক্ষুণি আসছি।' বলে তাঁর টেবিলে রাখা একটি গোলাপী নবে আঙ্গুল ছোঁয়ালেন ডক্টর গুণবর্ধন। পিয়ের লোটির সামনে থাকা স্ক্রীনটা অস্পষ্ট হয়ে গেল, দেওয়ালের অংশটুকু আবার যথাস্থানে ফিরে এলো। পিয়ের লোটি চেয়ার ছেড়ে উঠে আবার তাঁর টেলিভিস্নো-স্কোপের কাছে ফিরে এলেন।

ডক্টর গুণবর্ধন আর দেরী করলেন না। রকেট-লিফ্‌ট সার্ভিসের সাহায্যে ৫২৯ নম্বর তলায় নেমে গেলেন। সেখানে একমনে কাজ করছিলেন মঙ্গল গ্রহের জ্যোতির্বিজ্ঞানী গাছ-মানুষ জিম-জা আর বৃহস্পতির পঞ্চম চাঁদের বিজ্ঞান সাধিকা টিম্বিলা। গবেষণাগারে ডক্টর গুণবর্ধনকে ঢুকতে দেখে দু'জনেই একযোগে চোখ তুলে তাকালেন।

চাপা উত্তেজনায় থরথর ক'রে কাঁপছিল ডক্টর- গুণবর্ধনের কণ্ঠস্বর, বললেন,—'চলুন আমার সঙ্গে।'

গাছ মানুষ জিম-জা একরাশ ইলেকট্রনিক তঙ্গর ঢেলে দিলেন ঘরের বাতাসে, বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে সেই ঢেউ মানবিক কথায় রূপান্তরিত হয়ে শোনালো : 'কোথায় যাবে ডক্টর গুণবর্ধন ? আমি এখন কালপুরুষের অস্মোরশ্মির বিকিরণের ওপরে কাজ করছি।'

'ও কাজ এখন থাক, ওর চেয়ে বেশী দরকারী কাজ হাতে এসেছে জিম-জা—'

কৌতূহলী চোখ তুলে বৃহস্পতির বিজ্ঞানী টিম্বিলা বলল,—'কী এমন দরকারী কাজ ডক্টর গুণবর্ধন ?'

'সেই ক্রুগার-৬০ এর দিকে থেকে আসা রহস্যময় সঙ্কেতের উৎস খুঁজে বার করবার কাজ।'

ডক্টর গুণবর্ধনকে ঘিরে ধরল ওরা দুজন। নিজস্ব ভাষায় জিম-জা বলল,—'বলেন কি ডক্টর গুণবর্ধন ! আবার সেই সঙ্কেত এসেছে।'

টিম্বিলা ব'লে উঠলো,—'চলুন,—মাইক্রোটেপ বাজিয়ে শোনা যাক। এবার হয়তো রহস্যের ঘেরাটোপটা সরিয়ে দেখা যাবে তার আসল চেহারাটা।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই কনট্রোল রুমে এসে পড়লেন মঙ্গলগ্রহের গাছ মানুষ জিম-জা, বৃহস্পতির বিজ্ঞান সাধিকা টিম্বিলা আর অবজারভেটরীর ডিরেক্টার জেলারেল ডক্টর ভাবমূর্তি গুণবর্ধন। ডক্টর পিয়ের লোটি তাঁদের জন্যই অপেক্ষা করছিলেন, সবাইকে নিয়ে গেলেন কনট্রোল বোর্ডের কাছে।

চার বিজ্ঞানী মিলে মাইক্রোটেপে ধরে রাখা সেই রহস্যময় সঙ্কেতটা

বার বার বাজিয়ে শুনলেন, তারপর, সেটা ঘরের কোণে রাখা আনকোরা নতুন কাম্পা কম্পিউটারের মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। একটু পরে কম্পিউটারের মাথায় হলদে তারার আকারের মতো আলো জ্বলে উঠলো।

চেঁচিয়ে উঠলেন ডক্টর গুণবর্ধন,—'হলদে তারা,—আমরা যা অনুমান করেছিলাম তাই! এক্ষুণি গ্রহমণ্ডল সরকারের কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে আমাদের।'

জিম-জা একটা কনট্রোল সুইচ টিপলেন, পাশের দেওয়ালে বিশাল গ্যালাক্সীর নিখুঁত ছবি ফুটে উঠলো। একটা ফাইবার পয়েন্টার তুলে নিয়ে একটা তারাকে চিহ্নিত করে বললেন,—'এই হ'ল ক্রুগার-৬০, হলদে তারাটি খুব সম্ভব ওখান থেকে আধ আলোকবর্ষ দূরে এই দিকে আছে। সঙ্কেতটি কিন্তু প্রাকৃতিক নয়, মনে হচ্ছে যে হলদে তারার কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী এই সঙ্কেতগুলো মহাকাশে ছড়িয়ে দিচ্ছে।'

পিয়ের লোটিও জিম-জা-র কথায় সমর্থন করলেন,—'আমারও তাই অনুমান জিম-জা। সঙ্কেতটি প্রাকৃতিক নয়।'

ডক্টর ভাবমূর্তি গুণবর্ধন বললেন,—'তাহলে আর দেরী করা ঠিক হবে না পিয়ের লোটি। তুমি চটপট কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের ডিরেক্টার জেনারেল বিলম্বিত ব্যানার্জিকে সব কথা জানিয়ে দাও এক্ষুণি।'

তিন বিজ্ঞানী বেরিয়ে গেলেন, পিয়ের লোটি আবার কনট্রোল বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন।

কয়েক ঘণ্টার ভেতরেই গ্রহমণ্ডল সরকারের প্রত্যেকটি জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণাগার টেরাডেলফিউগোর অবজারভেটারীতে ধরা সেই রহস্যময় সঙ্কেতের কথা জানতে পারল। কয়েকদিন পরে আন্তর্গ্রহ মহা-বিজ্ঞানাগারে বিজ্ঞান আকাদামীর মাননীয় সদস্যরা জরুরী তলবী সভায় যোগ দিলেন এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে। বিশেষ আমন্ত্রণে ডক্টর পিয়ের লোটিও সাটল রকেটে চেপে সেই সভায় যোগ দিতে চলে গেলেন।

সেই বিজ্ঞান সভায় চুল-চেরা বিচার বিশ্লেষণ হল। হলদে তারা নিয়ে অনেক অলোচনা হল। তিন দিন পরে সভার সর্বসম্মত সিদ্ধান্তটি পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল গ্রহমণ্ডল সরকারের বিজ্ঞান মন্ত্রীর কাছে।

জাম্‌বিয়া।

গ্রহমণ্ডল সরকারের মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্রের মহা সচিবের ৭০৩ তলা অফিসের ঘরগুলো সকাল বেলার সোনা-রোদে ভরে গিয়েছিল। একটু আগেই সাফাই বাহিনীর রবটগুলো বৈদ্যুতিক ঝাঁটা দিয়ে ঘরগুলো পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে। মর্মর মসৃণ মেঝেতে রোদ যেন পিছলে যাচ্ছে।

হন্তদন্ত ভাবে রকেট-লিফটে চেপে নিজের প্রশস্ত অফিস ঘরে এসে ঢুকলেন মহাসচিব আবদুল কাদের। মাথা ভরতি কাঁচা-পাকা চুল, দীর্ঘ মেদবিহীন শরীর, মুখে ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি। পরনে আধুনিক শনিগ্রহ স্যুট। আবদুল কাদের নিজের চেয়ারে বসেই টেবিলের পাশে থাকা একটি লাল বোতাম টিপলেন। এক পাশের দেওয়াল নিঃশব্দে সরে গেল, একটি হালকা ফাইল হাতে এগিয়ে এলেন বিভাগীয় প্রধান সচিব স্মেরনভ্‌! স্মেরনভ্‌ যুবক, বয়স প্রায় পঁচিশ, চোখে কনটাক্ট লেন্স্‌। ফাইলটা আবদুল কাদেরের টেবিলে রাখবার আগে স্মিত হাসির সঙ্গে অভিবাদন জানালো স্মেরনভ্‌।

মাথা নুইয়ে তার জবাব দিয়ে তাড়াতাড়ি ফাইলটা খুলে ফেললেন আবদুল কাদের। প্রথম পাতাতেই আন্তর্গ্রহ মহাবিজ্ঞানাগারের বিজ্ঞান আকাদামীর মাননীয় সদস্যদের মন্তব্য লেখা ছিল:

টেরাডেলফিউগোর অবজারভেটারী থেকে পাওয়া মাইক্রোটেপ বাজিয়ে শোনা হ'ল। এবারের সঙ্কেতটি দীর্ঘস্থায়ী ও স্পষ্ট। ওটা এসেছে যুগ্মতারা ক্রুগার-৬০এর সন্নিহিত অঞ্চল থেকে। কাম্পা-কমপিউটার বলছে যে সঙ্কেতটা কোন এক হলদে তারা থেকে এসেছে! এ সঙ্কেত প্রাকৃতিক নয়, যান্ত্রিক, সুতরাং অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীই সঙ্কেতগুলো মহাকাশে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

সৌর জগতের বাইরে বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব আছে কি নেই তা ষড়বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানী মহলে এক বহু বিতর্কিত প্রশ্ন। এই প্রশ্নের মীমাংসার সুযোগ এবার এসেছে। আন্তগ্রহ সরকারের বিজ্ঞান আকাদামীর সদস্যরা চান যে এই জটিল প্রশ্নের মীমাংসা এবার হয়ে যাক। আমরা সমস্ত নথীপত্র ও রেকর্ড কেন্দ্রীয় মহাকাশ গবেষণাগারের মহাসচিবের কাছে পাঠাচ্ছি। তিনি যেন এ বিষয়ে যথাবিহিত ব্যবস্থা করেন।

মন্তব্যের নীচে বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীদের এক গাদা সই। তাঁদের কেউ পৃথিবীর মানুষ, কেউ মঙ্গল গ্রহের গাছ-মানুষ, কেউ বা শনির বলয় থেকে আসা শনি-মানুষ।

মন্তব্য পড়া শেষ হ'লে স্মেরনভের মুখে তাকালেন আবদুল কাদের। সপ্রতিভ ভাবে স্মেরনভ্ বলল, 'রেকর্ড আর অন্যান্য সব কিছু আমার টেবিলে আছে। দেখতে চান?'

হাত নেড়ে আবদুল কাদের বললেন,—'থাক, পরে দেখা যাবে সব। গভীর মহাকাশে আর একটা অভিযান পরিচালনা করবার দায়িত্ব এসে পড়েছে আমাদের ওপর। এটা হবে অভিযাত্রী মিশন, খুবই দায়িত্বপূর্ণ কাজ। কাকে দেওয়া যায় এই দুরূহ কাজের ভার।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ ক'রে রইলো স্মেরনভ্, তারপরে বুক পকেট থেকে একটা ছোট্ট ডায়েরী বার ক'রে পাতা ওলটাতে লাগল, একটু পরে মুখ তুলে বলল,—'এখন অফ্-ডিউটিতে আছে মহাকাশচারী কি-মা, সে মঙ্গলগ্রহে গেছে ছুটি কাটাতে—'

আবদুল কাদের ডান হাত তুলে ফ্রেঞ্চ্ কাট দাড়িতে আঙ্গুল বুলিয়ে বললেন,—'চপলতা বেশী, অভিজ্ঞতা কম।'

'আর আছে মহাকাশচারী হাকান—'

'শনির বলয়ের লোক সে। আন্তঃ কণিকা বিকিরণ খুব বেশী তার।'

'তা হ'লে বাকী থাকে গভীর মহাকাশচারী ব্যোমব্রহ্ম বসু—'

'হ্যাঁ, এই হ'ল যোগ্য লোক'—যেমন অভিজ্ঞ, তেমনি ধীরস্থির —অল্পদিন আগেই স্পেস কম্যাণ্ডার পদ দেওয়া হয়েছে তাকে।'

'সে কিন্তু অল্পদিন আগেই একটা মহাকাশ যাত্রা শেষ ক'রে পৃথিবীতে ফিরে এসেছে। এখন তার বিশ্রামের সময়।'

'তা হোক,—' আবদুল কাদের বললেন,—'তুমি তাকেই খবর দাও স্মেরনভ্। আর এই অভিযানে ওর সঙ্গে কোন কোন বিজ্ঞানী যাবেন তার একটা তালিকাও তৈরী ক'রে ফেল। এই মহাকাশ অভিযানের খুঁটিনাটি ব্যবস্থা করবার ভার তোমার ওপরেই রইলো,' ব'লে ফাইলের ওপরে খস খস ক'রে মন্তব্য লিখলেন মহাসচিব আবদুল কাদের।

ফাইল নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল স্মেরনভ্।

সুপার ডিস্ইন্টিগ্রেটিং রশ্মি দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার মাথাটা ছেঁটে ফেলা হয়েছিল সেই ২৫৫২ খৃষ্টাব্দে। তিলে তিলে হিমালয়ের শীর্ষে তৈরী হয়েছিল পৃথিবীর বৃহত্তম সহর কাঞ্চনজঙ্ঘা। বৃহস্পতি গ্রহের স্থপতিশ্রেষ্ঠ সি-কার পরিকল্পনায় হাজার তলা সুপার স্কাই স্ক্র্যাপারগুলো নিখুঁত জ্যামিতিক প্যাটার্ণে তৈরী হয়ে সহরের শোভা শতগুণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। বর্তমানে চার কোটি মানুষ থাকে কাঞ্চনজঙ্ঘায়। জনমতের ক্রমবর্ধমান চাপে ও অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্য থাকবার ফলে মঙ্গল গ্রহের হাজার ক্রোশী খালের ধারে অবস্থিত পাসকাভালাসা থেকে রাজধানী তুলে এনে কাঞ্চনজঙ্ঘায় স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন গ্রহমণ্ডল সরকার। এটাই এখন সর্বশ্রেষ্ঠ আন্তগ্র'হ সহর, তাই মঙ্গল, বৃহস্পতি আর শনির বলয় থেকে বহু নাগরিক কাঞ্চনজঙ্ঘায় এসে তার পাহাড়ী মায়ায় মুগ্ধ হয়ে স্থায়ী ভাবেই থেকে গেছে এখানে। তা ছাড়া রাজধানী সহর ব'লে আন্তগ্র'হ সরকারের বহু সরকারী কর্মচারীকে তো থাকতেই হয় এখানে। ফলে অল্পদিনেই বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে আন্তগ্র'হ সহর কাঞ্চনজঙ্ঘা।

সরকারী কর্মচারীদের জন্য বাইশটা অতিকায় ফ্ল্যাটবাড়ি নির্দিষ্ট করা ছিল। তারই একটার আট হাজার নয়শ তিন নম্বর ফ্ল্যাটে থাকে বিখ্যাত গভীর মহাকাশচারী স্পেস কম্যাণ্ডার ব্যোমব্রহ্ম বসু। বিয়ে থা করে নি, চার ঘরের প্রকাণ্ড ফ্ল্যাটে হাত-পা ছড়িয়ে দিব্বি আরামেই

থাকে। অবশ্য এই আরাম উপভোগ করবার মতো বিশ্রামের অবকাশ খুব কমই পায় সে, কারণ প্রায়ই তাকে দীর্ঘ দিনের জন্য গভীর মহাকাশ অভিযানের নায়ক হিসাবে আন্তগ্র্হ খ্যাতি আছে তার। সৌর মণ্ডলের গ্রহগুলির প্রধান প্রধান সব খবরের কাগজেই তার ফটো ছাপা হয়েছে, ছাপা হয়েছে তার অভিযানের পুঙ্খনাপুঙ্খ বিবরণ। এই সব কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবেই গ্রহমণ্ডল সরকার এই ভি. আই. পি. ফ্ল্যাটে থাকতে দিয়েছেন তাকে। আরাম আর স্বাচ্ছন্দ্যের সবরকম উপকরণ-ই মজুত আছে এখানে। সুইচ টিপলেই হাজির হয় তারা। তা ছাড়া স্পেস কম্যাণ্ডার হবার পর থেকে সরকারের কাছ থেকে একটি রবট ভৃত্যও পেয়েছে ব্যোমব্রহ্ম,—যা কিনা এই ২৫৭০ খৃষ্টাব্দেও দুর্লভ। রবট ভৃত্যটি অতি আধুনিক গবেষণার ফল, কথা বলা থেকে শুরু ক'রে হুকুম পাওয়া মাত্র যে কোনো আদেশই অত্যন্ত তৎপরতা আর নিপুণতার সঙ্গে করতে পারে সে।

সন্ধ্যা হতে আর দেরী নেই। সাটল রকেট ডাকে আসা বুধকুমারী বোম্বালভিয়ার চিঠিটা পড়ছিল স্পেস কম্যাণ্ডার ব্যোমব্রহ্ম বসু। পড়তে পড়তে বোম্বালভিয়ার ঘড়ির মতো চ্যাপ্টা মুখখানি বার বার তার চোখের সামনে ভেসে আসছিল, মাথার ওপরে খাড়া হ'য়ে থাকা সুচারু সুন্দর এ্যানটেনা দুটো। ইচ্ছে করলে ঐ এ্যানটেনা থেকে চার হাজার ভোল্ট বিদ্যুৎ ছড়িয়ে যে কোনো শত্রুকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে পারে বুধের বুদ্ধিমান প্রাণীরা। এ্যাসট্র-ফিজিক্সে ডক্টরেট হ'য়ে বোম্বালভিয়া এখন পৃথিবী আর মঙ্গল গ্রহের মাঝখানে ভাসমান স্পেস স্টেশন এক ৭২০র অধ্যক্ষা। নানা অভিযানে বেরিয়ে পড়বার সময়ে ঐ স্পেস-স্টেশনে বেশ কয়েকবার যেতে হয়েছে ব্যোমব্রহ্মকে। সেই সময়েই আলাপ হয়েছিল বোম্বালভিয়ার সঙ্গে। উৎসাহ দীপ্ত, উজ্জ্বল ঝকঝকে মেয়েটিকে খুব ভালো লাগে ব্যোমব্রহ্মর, তার প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করে। বোম্বালভিয়া যে তাকে গভীর ভাবে ভালোবেসে ফেলেছে তা-ও অজ্ঞাত নয় ব্যোমব্রহ্মের কাছে। তবু এখন পর্যন্ত মনস্থির করে উঠতে পারে নি সে, কারণ সময়টা ২৫৭০ খৃষ্টাব্দ

হ'লেও আন্তগ্র্ঁহ বিয়ে তেমন জনপ্রিয় হয় নি এখনো। কোথাও ও রকম বিয়ে হলে'ই রক্ষণশীল প্রাচীন পন্থীরা 'গেল গেল' রব তুলে চারদিক তোলপাড় ক'রে তোলেন। সৌর জগতের সব কটা গ্রহেই এই বিষয়টা প্রথম সামাজিক সমস্যা হিসেবে বেশ একটু গুরুত্ব পেয়েছে। বড় বড় খবরের কাগজে আন্তগ্র্ঁহ বিয়ের পক্ষে আর বিপক্ষে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে আন্তগ্র্ঁহ ও আঞ্চলিক ভাষায়।

বোম্বালভিয়ার চিঠিটাও আন্তগ্র্ঁহ ভাষায় লেখা, তাই বুঝতে কোন অসুবিধা হচ্ছিল না ব্যোমব্রহ্মের। প্রগতিবাদিনী বোম্বালভিয়া নানা যুক্তি তর্ক উত্থাপন ক'রে চিঠির শেষের দিকে লিখেছে যে গ্রহমণ্ডলের ঐক্যের জন্যই আন্তগ্র্ঁহ বিয়ে চালু হওয়া দরকার। এই ব্যবস্থা একদিন সমগ্র সৌর জগতের বিপুল সম্ভবনাময় ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বলতর করে তুলবে। এর ফলে ভবিষ্যতের প্রাণীরা যে আরও বুদ্ধিমান, সাহসী ও বলিষ্ঠ হ'য়ে জন্মাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই। মঙ্গলের মেধা, বৃহস্পতির বুদ্ধি, বুধের শারীরিক পটুতা আর পৃথিবীর সাহস ও প্রেম হয়তো একটি প্রাণীর মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে। শুক্রগ্রহে মেয়ে পুরুষে ভেদাভেদ নেই, নির্দিষ্ট সময়ের শেষে একটি প্রাণী স্বেচ্ছা বিভাজিত হ'য়ে দুটি প্রাণীতে পরিণত হয়, তাই ওদের হিসেবের মধ্যে ধরে নি বোম্বালভিয়া।

বোম্বালভিয়ার চিঠির অলিখিত বক্তব্য বুঝতে কোন অসুবিধা হচ্ছিল না ব্যোমব্রহ্মের। তাকে ভালোবেসে ফেলেছে বোম্বালভিয়া চিঠির ছত্রে ছত্রে তারই অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। এর চেয়ে স্পষ্ট ভাষায় কোন মেয়েই বা প্রেম নিবেদন করতে পারে তার প্রেমাস্পদের কাছে! বেশ কিছুক্ষণের জন্য বিমনা হয়ে রইলো ব্যোমব্রহ্ম। আন্তগ্র্ঁহ বিয়ের ঝুঁকি আছে অনেক। অন্য গ্রহের প্রাণীর সঙ্গে পৃথিবীর মানুষের জীবকোষের মধ্যে রয়েছে মূলগত পার্থক্য। ক্রোমোজোম, জীন আর ডি. এন. এ. একেবারেই আলাদা। অবশ্য গ্রহমণ্ডল সরকারের বিশাল গবেষণাগারগুলোতে আন্তগ্র্ঁহ খ্যাতিসম্পন্ন জীব-বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে প্রচুর

গবেষণা করে চলেছেন এবং অচিরেই এই সমস্যার সমাধান হ'য়ে যাবে ব'লে মনে করেন। ইতিমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের স্ত্রী পুরুষেরা পরস্পরকে ভালোবাসছে, বিয়েও করছে কেউ কেউ, কিন্তু এ ধরনের কোনো ক্ষেত্রেই কারুর কোন সন্তান হয় নি। ট্রুয়ামের বোতল হাতে রবট ভৃত্য কাছে এসে দাঁড়ালো। চিঠির সঙ্গে এক বোতল ট্রুয়ামও পাঠিয়েছে বোম্বালভিয়া। মঙ্গল গ্রহের সব চেয়ে দামী আর সবার সেরা ট্রুয়াম খেতে ভীষণ ভালবাসে ব্যোমব্রহ্ম। কিন্তু আন্তগ্র'হ শুল্কের জন্য পৃথিবীতে তার আকাশ-ছোঁয়া দাম। ট্রুয়ামের বোতলটা হাতে তুলে নিয়ে লেবেলটা দেখল ব্যোমব্রহ্ম। লেবেলের পাশেই বোম্বালভিয়ার পরিচিত হাতের লেখা, আন্তগ্র'হ ভাষায় লিখেছে ঃ প্রিয়তম ব্যোমব্রহ্মকে বোম্বালভিয়ার প্রীতি উপহার!

বোতলটা গালে চেপে ধরল ব্যোমব্রহ্ম, যেখানে 'বোম্বালভিয়া' কথাটা লেখা ছিল সেখানে চুমু খেল একটা। রবট একটা সিলিকোলাইড্ গ্লাস নিয়ে এলো। গ্লাসে আঙ্গুল চারেক ট্রুয়াম ঢালল ব্যোমব্রহ্ম, একটু একটু ক'রে খেল। আঃ, কী স্বর্গীয় স্বাদ! একটা তুষার গলা হিমস্রোত গলা দিয়ে নেমে তার শরীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে তার শরীর আর মন থেকে সব ক্লেশ, সব অবসাদ দূর হয়ে গেল, নবীন উৎসাহে টগবগ করতে লাগল সে। দীর্ঘ চার বছরের অবিচ্ছিন্ন মহাকাশ অভিযানের শেষে শরীরে যে ঝিম্-মারা ভাব বাসা বেঁধেছিল তা কয়েক মিনিটের মধ্যেই দূর হয়ে গেল। শরীর আর মন ঝকঝক করতে লাগল।

ট্রুয়ামের বোতল রেখে দিয়ে ঘড়ির দিকে তাকালো ব্যোমব্রহ্ম। আন্তগ্র'হ ক্ষেত্রে স্বীকৃত বৃহস্পতির সময় অনুসারে সাতটা বাজতে দু' মিনিট বাকী। ঠিক সাতটার সময়ে বৃহস্পতির দু' নম্বর চাঁদের প্রতিভাময়ী চিত্র পরিচালিকা পিয়োপি-র একটা হিট ছবি দেখানো হবে। ওতে মঙ্গল গ্রহের বিখ্যাত অভিনেত্রী গাছ-মানুষ বিং গিলা নাকি অপূর্ব অভিনয় করেছে।

ঘরের সিলিকোলাইড দেওয়ালের গায়ে একটি লম্বা প্যানেল, তার

গায়ে নানা রং এর সারি সারি সুইচ, লিভার ফিট করা ছিল। কাছে গিয়ে একটা লিভার টেনে দিল ব্যোমব্রহ্ম, সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণের দেওয়াল জুড়ে নেমে এলো আকাশী রং-এর এক বিশাল স্ক্রীন। ঘরের আলো কমতে কমতে নিষ্প্রভ হয়ে এলো। ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় ফিরে এসে স্ক্রীনের দিকে মুখ ক'রে একটা আরাম চেয়ারে ব'সে পড়ল ব্যোমব্রহ্ম।

হঠাৎ দক্ষিণের দেওয়াল, স্ক্রীন সব যেন অনেক দূরে সরে গেল, সেই শূন্যতার মাঝখানে আবির্ভাব ঘটল থ্রি-ডাইমেনশন ছবির, মনে হচ্ছিল যে একেবারে জীবন্ত। এ্যামোনিয়া ভরা শনির বলয়ের আঁশটে গন্ধও নাকে এলো ব্যোমব্রহ্মার। শনিগ্রহের অতুলনীয় প্রাকৃতিক দৃশ্যই ছবিটির প্রধান সম্পদ। দেখতে দেখতে মগ্ন হয়ে গেল ব্যোমব্রহ্ম। জমাট এ্যামোনিয়ায় ঢাকা হাজার হাজার মাইল লম্বা খাড়া পাহাড়, তার গায়ে বিচিত্র বর্ণের উদ্ভিদ বিয়াম্বিলা। শুক্র গ্রহ থেকে এক দল শুক্র মানুষ উপনিবেশ স্থাপন করতে এসেছে সেখানে, সঙ্গে আছে মঙ্গল রূপসী বিং গিলা। এক দিকে প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে দুর্মর লড়াই অন্য দিকে মন দেওয়া-নেওয়ার পালা। কিন্তু এ প্রেম শারীরিক অর্থে নিষ্ফল, কারণ শুক্র গ্রহের প্রাণীর প্রজনন ক্ষমতা নেই, তারা এ্যমিবার মতো, স্পাইরোগ্যাইরার মতো নিজেদের কোষ বিভাজন করে এক থেকে দুই হয়। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ও হতাশার ছবিটি সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছিল ছবিটিতে।

প্রায় চার বছরের মহাকাশ-যাত্রার পর এই সেদিন পৃথিবীতে ফিরে এসেছে ব্যোমব্রহ্ম। এর মধ্যে যে সিনেমা শিল্প কতখানি উন্নতি করেছে তার চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে চমৎকৃত হল সে। চিত্র পরিচালিকা পিয়োম্পির এই বাস্তবধর্মী ছবিটা খুব ভালো লাগল তার, হয়তো এর মধ্যে তার আর বোম্বালভিয়ার প্রেমজ সমস্যার একটা সমাধান খুঁজছিল সে। মঙ্গলের গাছ মানুষ অভিনেত্রী বিং গিলা আর শুক্র গ্রহের বলিষ্ঠ অভিনেতা আ-কার অভিনয় শিল্পের সর্বোৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে এদের বুঝি কোন জুড়ি নেই কোথাও।

কিন্তু ছবি দেখার আনন্দটা পুরোপুরি উপভোগ করতে পারল না ব্যোমব্রহ্ম। তার ডান হাতে বাঁধা চৌকো ঘড়ির আকারের একটি যন্ত্রের ডায়ালে হঠাৎ লাল আলো জ্বলে উঠলো। জরুরী সঙ্কেত! সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত পদে প্যানেলের কাছে গিয়ে নীল রং-এর সুইচটিতে আঙ্গুল ছোঁয়ালো ব্যোমব্রহ্ম। চোখের পলকে স্ক্রীন থেকে ছবি মিলিয়ে গেল, সিলিকোলাইড স্লাইডিং দেওয়াল যথাস্থানে ফিরে এলো। ঘরের আলো আবার উজ্জ্বল হ'য়ে গেল।

জরুরী সংকেত, জরুরী সংকেত। ছুটে গিয়ে পূর্ব দিকের দেওয়ালের কাছে প্রকাণ্ড টেলিভিসোস্কোপের সামনে গিয়ে বসল ব্যোমব্রহ্ম, লাল রং-এর একটি সুইচ টিপে দিল। ০·৭৫ মিটার স্ক্রীনে গ্রহমণ্ডল সরকারের স্পেস-ডিভিশনের কম্যাণ্ডাণ্ট্ বিলিং-এর হাতির মতো মুখখানা ভেসে উঠলো। তার নাকটা লম্বা হ'য়ে ছোটখাটো শুঁড়ের মতো হয়ে গেছে, ঠিক যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের ম্যামথ। শনির বলয়ের সব প্রাণীরই ঐ একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছে ব্যোমব্রহ্ম। কিন্তু শরীর বেঢপ হ'লে কি হবে, বুদ্ধি ওদের খুবই তীক্ষ্ণ। তাছাড়া ভীষণ পরিশ্রমী ওরা। সৌরজগতের আর কোণ প্রাণীই ওদের মতো খাটতে পারে না।

টেলিভিসোস্কোপের পরদায় ফুটে ওঠা বিলিংএর মুখখানা তিন ডাইমেনশনের, তাই মনে হচ্ছিল যে বিলিং বুঝি ব্যোমব্রহ্মের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। সারা ঘরে পূর্ণিমা রাতের মতো স্নিগ্ধ আলো আর অখণ্ড নীরবতা। সেই নীরবতা ভঙ্গ করে খনখনে গলায় আন্তগ্রহ ভাষায় বিলিং বলল, 'তোমার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাবার জন্য আমি দুঃখিত স্পেস কম্যাণ্ডার—'

শুধু দুঃখ প্রকাশেই কি সব ক্ষতি পূরণ হয়! তবে বিলিং বস হিসেবে ভালো সংবেদনশীল, তাই মনের বিরক্তি দমন ক'রে ব্যোমব্রহ্ম বলল,—'কী ব্যাপার বিলিং?'

'মহাকাশ সেক্রেটারিয়েট থেকে জরুরী নির্দেশ এসেছে'—মনে মনে দমে গেল ব্যোমব্রহ্ম, চার বছর ধরে মহাকাশ পরিক্রমা করে সবে বাড়ি

ফিরেছে সে, এরই মধ্যে জরুরী নির্দেশ এসে গেল! শুকনো গলায় বলল,—'কী নির্দেশ বিলিং ?'

'তোমাকে একবার টেরাডেলফিউগোর অবজারভেটারীর ডিরেক্টার জেনারেল ডক্টর ভাবমূর্তি গুণর্ধনের সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

—'সে কি ? কখন ?'

—'এক্ষুণি।'

কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইলো ব্যোমব্রহ্ম। ট্রুয়াম খেয়ে যদিও ওর মহাকাশ যাত্রার গভীর অবসাদ কিছু অংশে দূর হয়েছিল, তবু এক্ষুণি আর একটা অভিযানের কথা ভাবতেও ভালো লাগছিল না তার।'

ব্যোমব্রহ্মকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে একটু নরম সুরে বিলিং বলল,—'গ্রহমণ্ডল সরকারের বিজ্ঞান আকাদামী তোমাকেই নির্বাচন করেছেন ব্যোমব্রহ্ম। এতে আমার কোনো হাত ছিল না।'

'কিন্তু কিসের জন্য কম্যাণ্ডাণ্ট্ বিলিং ? কী করতে হবে আমাকে ?'

'গভীর মহাকাশে একটা বিজ্ঞান মিশনের অভিযানের নেতৃত্ব করতে হবে তোমাকে।'

গভীর মহাকাশ! তার মানে চার কি পাঁচ কি সাত বছরের প্রোগ্রাম! হতাশায় যেন ভেঙ্গে পড়ল ব্যোমব্রহ্ম, বিক্ষুব্ধ স্বরে বলল,—'সেকি! এ ধরনের কোনো প্রোগ্রাম তো ছিল না। আমার তো এখন ছয় মাস পুরো বিশ্রাম করবার কথা বিলিং।'

"তা অবশ্য ঠিক। আমরা অন্য মহাকাশচারীর কথা বলেছিলাম, কিন্তু গ্রহমণ্ডল সরকারের বিজ্ঞান আকাদামীর সভাপতি একেবারে নাছোড়বান্দা, তিনি তোমাকেই চান। আমি নিরুপায় ব্যোমব্রহ্ম।'

পুরো দু' মিনিট চুপ ক'রে রইলো ব্যোমব্রহ্ম। ক্লান্ত থাকলেও যুদ্ধের ঘোড়া যেমন যুদ্ধের বাজনা শুনলে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে, বিলিং-এর কথা শুনে ব্যোমব্রহ্মও তেমনি ভাবে একটু একটু করে চাঙ্গা হয়ে উঠছিল। বোতল এনে ঢক ঢক করে আরও খানিকটা ট্রুয়াম খেল সে। উৎসাহ ও উদ্দীপনার স্রোতে তার সারা শরীর কাঁপতে লাগল।

গলা পরিষ্কার করে নিয়ে ব্যোমব্রহ্ম বলল—'এই বিজ্ঞান-মিশন অভিযানের উদ্দেশ্য কি কম্যাণ্ডাণ্ট্ বিলিং?'

'আমিও সঠিক জানি না স্পেস-কম্যাণ্ডার। তবে শুনেছি যে খুবই বিপদ সঙ্কুল অভিযান এটা। তা ছাড়া ভীষণ জরুরী। তুমি ডক্টর ভাবমূর্তি গুণবর্ধনের সঙ্গে দেখা কর, তিনিই সব কথা বুঝিয়ে বলবেন তোমাকে!'

'কিন্তু কি করে যাবো টেরাডেলফিউগোতে? সে যে এখান থেকে প্রায় পনেরো কুড়ি হাজার মাইল দূরে।'

'সে ব্যবস্থা আমরা করেছি। মিনিট পনেরোর মধ্যে তোমার বাড়ির ছাতে একটি হেলিকপ্টার-ট্যাক্সি নামবে। চালক একজন রবট। তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া আছে। তুমি শুধু হেলিকপ্টার-ট্যাক্সিতে উঠে বসবে বাকী সে-ই করবে। আর দেরী না করে চটপট তৈরী হয়ে নাও। তোমার যাত্রা শুভ হোক—' ব'লে হাত দুটো মাথার ওপর তুলল বিলিং। তার পোষাকের বুকের কাছে মহাকাশ-সিম্বলটি ঝকঝক ক'রে উঠল; সেই রশ্মি যেন ব্যোমব্রহ্মের কপাল ছুঁয়ে গেল। ব্যোমব্রহ্মও হাত দুটো মাথার ওপর তুলল।

টেলিভিসোস্কোপের পরদা থেকে কম্যাণ্ডাণ্ট্ বিলিং-এর হাতির মতো মুখখানা মিলিয়ে গেল। দ্রুতপদে পাশের ঘরে চলে গেল ব্যোমব্রহ্ম। হাতে সময় আছে মাত্র পনেরো মিনিট, এরই মধ্যে সব কিন্তু ঠিকঠাক করে নিতে হবে তাকে। ঘরোয়া পোষাক ছেড়ে হ্যাঙ্গার থেকে বাইরে যাবার পোষাক টেনে নিল সে, রবটকে ডেকে বলল মহাকাশে যাবার স্যুটকেস চারটি গুছিয়ে দিতে।

বারো মিনিটের মধ্যেই দাড়ি কামানো, স্নান আর পোষাক পরা হয়ে গেল ব্যোমব্রহ্মের। ড্রয়ার খুলে দুটো প্রোটিন পিল মুখে পুরলো, তার পরে রবট ভৃত্যের হাত থেকে স্যুটকেসগুলি নিয়ে প্যাসেজে থাকা ট্রলির ওপরে রাখল। অল্প দূরেই লিফ্ট। ট্রলিসহ লিফ্টে উঠে একটা বোতাম টিপতেই হু হু ক'রে ওপরে উঠতে লাগল লিফ্টটা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ছাতে পৌঁছে গেল ব্যোমব্রহ্ম।

পাঁচটা ফুটবল খেলার মাঠের মতো ম্যাগনেটাইট কংক্রীটের বিশাল ছাত। প্রাগৈতিহাসিক বিশাল টেরোডেক্‌টাইল পাখির মতো হেলি-কপ্টার-ট্যাক্সিটা মাথার ওপর ঘুরপাক খাচ্ছিল। ব্যোমব্রহ্মকে দেখতে পেয়েই হুশ্‌ ক'রে নেমে পড়ল তার সামনে। হেলিকপ্টার-ট্যাক্সির গর্ত থেকে স্বয়ংক্রিয় ছোট লিফ্‌ট বেরিয়ে ছাতে এসে থামল, ট্রলি থেকে সুটকেস চারটে তার ভেতরে ঢোকালো ব্যোমব্রহ্ম, নিজেও উঠে পড়ল। হেলিকপ্টার-ট্যাক্সির ভেতরটা নয়ন লোভন। খান কয়েক পুরু হিপাটিলামের গদী আঁটা চেয়ার, বসলে কোমর অবধি ডুবে যায়। ছোট শেলফে খান কয়েক নির্বাচিত বই। সামনে সিনেমার পরদা। নির্বাচিত ফিল্‌মের নাম লেখা সুইচে আঙ্গুল ঠেকালেই নির্দিষ্ট ছবি দেখা যাবে। ছোট একটি টেলিভিসোস্কোপও আছে একধারে।

ব্যোমব্রহ্ম চেয়ারে বসার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ-ট্যাক্সির দরজা বন্ধ হয়ে গেল, আণবিক জ্বালানী চালিত হেলিকপ্টারটা আকাশে ভাসল, সোজা ওপরে উঠে পশ্চিম দিকে উড়তে লাগল।

আণবিক শক্তি চালিত হেলিকপ্টার-ট্যাক্সিগুলোতে কোনো মানুষ-চালক থাকে না, রবটরাই চালায় সেগুলো অভ্রান্ত নিপুণতার সঙ্গে। ব্যোমব্রহ্মের হেলিকপ্টার-ট্যাক্সির চালক রবটটি আগেভাগেই যাবতীয় নির্দেশ তার ইলেকট্রনিক মস্তিষ্কে গেঁথে নিয়েছিল, তাই কিছুই বলতে হ'ল না তাকে। ঘণ্টায় পাঁচ হাজার মাইল বেগে টেরাডেলফিউগোর দিকে উড়ে চলল ট্যাক্সিটা, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই আরব সাগর পার হয়ে আফ্রিকা মহাদেশের ওপর দিয়ে উড়তে লাগল।

কিছুক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকে একটা বই টেনে নিল সে। আন্তর্গ্রহ ভাষায় লেখা নাম: মঙ্গল গ্রহের সমাজ বিজ্ঞানে পৃথিবীর মানুষের ভূমিকা। লেখক প্রলয় ব্যানার্জি।

২৫৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে আবহাওয়ার ওপর পুরোপুরি কর্তৃত্ব এসে গিয়েছিল পৃথিবীর মানুষের। সর্বত্র সুষম বৃষ্টিপাতের ফলে অনিঃশেষ খাদ্য ভাণ্ডার গড়ে উঠেছিল। সমুদ্রের জলকে হাইড্রোজনে বিশ্লিষ্ট

করে তাকে দশ লক্ষ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে উত্তপ্ত করায় যে চেইন রিএ্যাকশন হ'ত তার ফলে খুব কম খরচে পাওয়া যেতো তাপ বিদ্যুৎ। ক্ষেতে খামারে, কলে কারখানায়, সহরে গ্রামে বিদ্যুৎতের আশীর্বাদ ছড়িয়ে পড়েছিল। কয়েকটি কৃত্রিম চাঁদ সব রাতকেই পূর্ণিমার রাতের মতো স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল, ঝকঝকে করে রেখেছিল!

এছাড়া সামুদ্রিক উদ্ভিদ ক্লোরেলা থেকে সুষম খাদ্য তৈরী করে মঙ্গল, বুধ ও শনির বলয়ে রপ্তানি করে প্রচুর ফরেন এক্সচেঞ্জ জমা হচ্ছিল পৃথিবী ইউনিটের অর্থভাণ্ডারে। সেই অর্থ ব্যয় করে মঙ্গলের কৃষি-ইনজিনীয়ারদের নিয়োগ করে গোবী, কালাহারী, প্যাটাগোনিয়া, থর ও সাহারা মরুভূমিকে শস্য-শ্যামল করে তোলা হয়েছে।

বই পড়তে পড়তে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল ব্যোমব্রহ্ম, সে লক্ষ্যই করেনি যে গিনি-উপকূল দিয়ে যাবার সময়ে আকাশ অন্ধকার করে এক বিশাল টর্ণেডো এগিয়ে আসছে, তার প্রথম ঝাপটাতেই হেলিকপ্টারটা দুলে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে হেলিকপ্টার-ট্যাক্সির অটোমেটিক কনট্রোল সক্রিয় হয়ে উঠলো, বিপদ সঙ্কেত পাঠালো কিলিম্যানজারোর কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরে। সঙ্গে সঙ্গে ওপরে উঠতে লাগল ট্যাক্সিটা।

একটু পরে জানালা দিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল ব্যোমব্রহ্ম। কিলিম্যানজারোর আবহাওয়া দপ্তর এরই মধ্যে ব্যবস্থা নিয়েছে, প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের বেগ বেশ কমে গেছে, ট্যাক্সির অটোম্যাটিক কনট্রোল আর লাল আলো দেখাচ্ছে না, হলদে বাতিটা জ্বলে উঠেছে। আবার নীচে নেমে এলো হেলিকপ্টার-ট্যাক্সিটা। ভূপৃষ্ঠ থেকে দশমাইল উচ্চতায় উড়তে লাগল।

পাঁচ ঘণ্টা সাত মিনিট পরে ব্যোমব্রহ্মের হেলিকপ্টার-ট্যাক্সি টেরাডেলফিউগোর অবজারভেটারীর বিশাল ছাতের ওপর নেমে পড়ল। ছোট লিফ্‌টে চেপে মালপত্র নিয়ে ছাতে নেমে এলো ব্যোমব্রহ্ম। ট্যাক্সি চালক রবট, যন্ত্র-মানুষ, তাকে ধন্যবাদ জানালো ব্যোমব্রহ্ম।

ছাতের ওপর অবজারভেটারীর একটি রবট অপেক্ষা করছিল। নিঃশব্দে

স্যুটকেসগুলো তুলে নিল সে, তারপর খনখনে যান্ত্রিক গলায় ব্যোমব্রহ্মকে অনুসরণ করতে বলে লিফ্‌টের দিকে এগিয়ে গেল।
৫৩২ তলার একটি প্রশস্ত করিডরে থেমে গেল লিফ্‌ট। বাইরে আসতেই মঙ্গল গ্রহের জ্যোতির্বিজ্ঞানী জিম-জা অভ্যর্থনা জানালেন স্পেস-কম্যাণ্ডার ব্যোমব্রহ্ম বসুকে, বললেন,—'আমার নাম জিম-জা, অবজারভেটারীর পক্ষ থেকে আপনাকে আমি সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি স্পেস-কম্যাণ্ডার। ডক্টর গুণবর্ধন এবং অন্য সবাই হল-ঘরে অপেক্ষা করছেন আপনার জন্য।'
আন্তগ্রহ ভাষায় কথা বলছিলেন জিম-জা ব্যোমব্রহ্মও আন্তগ্রহ ভাষায় বলল,—'কি ব্যাপার বলুন তো জিম-জা? হঠাৎ এই গভীর মহাকাশ অভিযানের আয়োজন করা হয়েছে কেন?'
ঝাউপাতার ভেতর দিয়ে জোরে হাওয়া বইলে যেমন আওয়াজ হয় তেমনি আওয়াজ করে হেসে উঠলেন মঙ্গলের গাছ মানুষ জিম-জা, ভাঙলেন না কিছুই, রহস্যময় ভাবে বললেন,—'চলুন না আমার সঙ্গে, হল-ঘরে গেলেই সব কিছু জানতে পারবেন।'
কাঁধ নেড়ে একটা ভঙ্গী করে ব্যোমব্রহ্ম বলল,—'চলুন তা হ'লে।'

বিশাল হল-ঘর। ঘরের মাঝখানে ঘোড়ার খুরের আকারের প্রকাণ্ড টেবিলের ধারে সাজানো চেয়ারগুলোতে বসেছিলেন পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ থেকে আসা একদল বুদ্ধিমান প্রাণী। কয়েকজনকে চেনে ব্যোমব্রহ্ম, বাকী সবাই অচেনা। কৌতূহল মাখা চোখে সবার মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে অবজারভেটারীর ডিরেক্টার জেনারেল ডক্টর ভাবমূর্তি গুণবর্ধনের মুখে তাকালো ব্যোমব্রহ্ম। প্রশ্নমুখর চোখের ভাষায় তাকে এখানে আনবার কারণটা জানতে চাইলো।
স্মিত হেসে ডক্টর গুণবর্ধন বললেন,—'বসুন স্পেস-কম্যাণ্ডার। আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম আমরা। এবার আসল কাজ শুরু করা যেতে পারে।'
চুপচাপ একটা খালি চেয়ারে বসে পড়ল ব্যোমব্রহ্ম। তার দু'পাশে

সৌর-জগতের বিভিন্ন গ্রহ থেকে আসা নরনারী। বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলো তারা।

সময় নষ্ট করা ডক্টর গুণবর্ধনের স্বভাব নয়, তাই সরাসরি কাজের কথায় এলেন তিনি, একটা সবুজ ফাইল খুলে বললেন,—'শুনুন স্পেস-কম্যাণ্ডার, গভীর মহাকাশ থেকে মাঝে মাঝে আমরা এক ধরনের রহস্যময় সঙ্কেত পাচ্ছিলাম। আমাদের অবজারভেটারীর স্টেরিওগ্রাফ্ যন্ত্রে তা ধরা পড়েছে, মাইক্রোটেপে তার রেকর্ডিং করা হয়েছে। সঙ্কেতটা বিশ্লেষণ করে আমরা বুঝতে পেরেছি যে মহাকাশের বিকিরণ-বলয় বা তারকার বিস্ফোরণের ফলে যে রেডিও তরঙ্গ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়, তার সঙ্গে এই সঙ্কেতের কোনো মিলই নেই। এই সঙ্কেত আসছে মহাকাশের কোনো এক বুদ্ধিমান প্রাণীর কাছ থেকে। কিন্তু কী বলতে চায় ওরা?'

হলঘরের সবাই নীরব মনোযোগের সঙ্গে ডক্টর গুণবর্ধনের কথা শুনছিলেন। সবার মুখের ওপর দিয়ে দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে পিয়ের লোটির দিকে মুখ ফেরালেন ডক্টর গুণবর্ধন,—'পিয়ের লোটি, দয়া করে মাইক্রোটেপ চালু করুন, আর সেই সঙ্গে ফটো-স্ক্রীন।'

সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন পিয়ের লোটি, ঘরের কোণে রাখা মাইক্রোটেপ রেকর্ডিং মেশিনের কাছে গেলেন। কনট্রোল-ভল্যুম ঠিক করে সুইচ্ অন্ করে দিলেন। আর একটা বোতামে আঙ্গুল ছোঁয়াবামাত্র হলঘরের আলো মৃদু হয়ে এলো, সামনের দেওয়ালে একটা হালকা নীল রং-এর পরদা উঠে এলো। সেই আলো-আঁধারীতে পরদার গায়ে ফুটে উঠলো গ্যালাক্সীর ছবি। কোটি কোটি তারায় ভরা গভীর কালো আকাশে তারাগুলো যেন হীরের কুচির মতো জ্বলছিল। সব তারা সমান উজ্জ্বল নয়। কারুর আকার বড়, কারুর বা ছোট। বিশাল গ্যালাক্সীতে সৌর পরিবার অতি সামান্য জায়গা নিয়ে ছিল। মেশিনের আলোর পয়েণ্টার প্রথমে গ্যালাক্সীর কেন্দ্রে গিয়ে পড়ল, তারারা এখানে সংখ্যায় বেশী আর বেশ ঘন, তারপর আলোর পয়েণ্টার এগিয়ে গেল যুগ্মতারা ক্রুগার-৬০

এর দিকে, সেখান থেকে একটু সরে একটা হলদে তারার ওপর পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে মাইক্রোটেপে সঙ্কেত বেজে উঠল ঃ ব্রিন্ ব্রিন্ ব্রিন্···ক্রা ক্রা···ট্রা ট্রা···ভ্যাস ভ্যাস···হোয়াশ···

আওয়াজটা ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে গেল। স্ক্রীন সরে গেল, ঘর আবার আলোময় হল। পিয়ের লোটি নিজের জায়গায় ফিরে এলেন।

ডক্টর গুণবর্ধন বললেন,—'এই সেই সঙ্কেত যা আমাদের যন্ত্রে তিন বার ধরা পড়েছে। সঙ্কেতটা এসেছে ঐ হলদে তারা থেকে। এখন কথা হচ্ছে হলদে তারার বুদ্ধিমান প্রাণীরা গ্যালাক্সীর গভীরে বসে কী বলতে চাইছে আমাদের? তারা কি কোনো বিপদে পড়ে সাহায্য চাইছে আমাদের কাছে? নাকি অন্য গ্রহের বুদ্ধিমান প্রাণীর সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করতে চায়, সাংস্কৃতিক বিনিময় চায়? আমাদের শ্রেষ্ঠ কমপিউটারও এই সঙ্কেতের সঠিক অর্থ বার করতে পারে নি।'

সবাই অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে ডক্টর গুণবর্ধনের কথা শুনছিলেন। বিষয়টা ব্যোমব্রহ্মের কাছেও পরিষ্কার হয়ে আসছিল।

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে আবার বলতে আরম্ভ করলেন ডক্টর গুণবর্ধন,—'আমাদের গ্রহমণ্ডল সরকারের বিজ্ঞান আকাদমীর সদস্যরা কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চিত যে অত্যন্ত শক্তিশালী আণবিক ট্রান্সমিটার ছাড়া এ ধরনের সঙ্কেত তরঙ্গ সৃষ্টি করা একেবারেই অসম্ভব। যে প্রাণীরা বহু আলোকবর্ষ দূর থেকে এ ধরনের সঙ্কেত তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত করতে পারে, তারা যে জ্ঞানে বিজ্ঞানে আমাদের সমকক্ষ কিংবা আমাদেরও ছাড়িয়ে গেছে এ ধরনের অনুমান আশা করি অসঙ্গত হবে না। হয়তো তারা পৃথিবী কি সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ কিংবা মহাকাশের অন্য কোনো তারার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছে।'

ডক্টর গুণবর্ধনের কথাগুলো মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল সবাইকে। তিনি একটু দম নেবার জন্য থামতেই স্পেস-কম্যাণ্ডার ব্যোমব্রহ্ম বলে উঠলো,—'আমার ধারণা কিন্তু এর বিপরীত ডক্টর গুণবর্ধন। গভীর মহাকাশে বেশ কয়েকবার অভিযান চালিয়েছি আমি, লক্ষ লক্ষ তারাদের পথ অতিক্রম করেছি, কিন্তু সৌরজগতের গ্রহগুলির মতো

বুদ্ধিমান প্রাণীদের অস্তিত্ব কোথাও দেখতে পাই নি। আমার ধারণা এই যে, তারারা সব উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হতে পারে, কিন্তু আসলে তারা মৃত। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই এ কথা বলছি আমি।'

ব্যোমব্রহ্মের কথা শুনে একটুখানি হাসলেন ডক্টর গুণবর্ধন, বললেন—'আপনার অভিজ্ঞতাকে আমি অবহেলা করছি না স্পেস-কম্যাণ্ডার, কিন্তু গ্যালাক্সী ভরা অগণ্য তারাদের মধ্যে ক'টি তারার পথই বা অতিক্রম করেছেন আপনি? সুদূর অতীতে বিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে পৃথিবী ছাড়া সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহে জীবনের বিকাশ হয় নি, অথচ আজ এ কথাটা দিবালোকের মতোই স্পষ্ট যে পৃথিবী ছাড়াও বুধ, মঙ্গল, শুক্র, বৃহস্পতি ও শনির বলয়ে শুধু যে জীবনের বিকাশই হয়েছে তা নয়, পৃথিবীর মনুষের মতোই বুদ্ধিমান প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছে—'

ডক্টর গুণবর্ধনের কথা শেষ হতে পারল না, তার আগেই বিভিন্ন গ্রহ থেকে আসা বিজ্ঞানীরা হর্ষধ্বনি করে উঠলেন।

মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন ডক্টর গুণবর্ধন, বললেন,—'আন্তগ্র্হ বিজ্ঞান আকাদামীর মাননীয় সদস্যরা মনে করেন যে গভীর মহাকাশের ঐ হলদে তারাটিতে এ্যাটমিক এনার্জি উৎপন্ন করবার মতো প্রয়োগ কুশলী বুদ্ধিমান প্রাণী সত্যি সত্যিই আছে। মনে রাখবেন আন্তগ্র্হ বিজ্ঞান আকাদামীর সদস্যরা সবাই যাচাই করা বিজ্ঞানী। পৃথিবী, বুধ, মঙ্গল, শুক্র, বৃহস্পতি ও শনির বলয় থেকে দু'জন করে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী ঐ বিজ্ঞান আকাদামীর সদস্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন। কাজেই তাঁদের মতামতকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাঁর এই সঙ্কেতগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করে, বিচার বিশ্লেষণ করেই এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। ওঁদের মতামত মান্য করতেই হবে আমাদের।'

ব্যোমব্রহ্ম বলল,—'হ্যাঁ, সে তো বটেই। আমাদের জ্ঞান আর কতটুকু।'

ব্যোমব্রহ্মের বিনয়-বচনে খুশী হলেন ডক্টর গুণবর্ধন, সভার অন্য

সবার মুখে তাকিয়ে বলতে লাগলেন,—'আপনারা জানেন যে সৌর-জগতের বাইরে আমাদের বিশাল গ্যালাক্সীতে কোটি কোটি গ্রহ তারকার সমাবেশ ঘটেছে। সেখানে জীবনের অস্তিত্ব আছে কি নেই এটা অতি পুরাতন বিতর্কিত বিষয়, তবু আমাদের বিজ্ঞান আকাদামী তারই সন্ধানে সর্বাত্মক প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এ যাবৎ তাঁদের সব পরীক্ষা-নিরীক্ষাই ব্যর্থ হয়েছে। এই বিশাল গ্যালাক্সীতে আমরা যে একেবারে একা এই বোধটাই অধিকাংশ বিজ্ঞানীর মনে দানা বাঁধতে শুরু করেছে। সবাই যখন ধরেই নিয়েছিলেন যে এই গ্যালাক্সীর কোনো তারাতেই জীবনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না ঠিক সেই সময়ে এলো হলদে তারা থেকে এই রহস্যময় সঙ্কেত। উৎসাহে টগবগ করতে লাগলেন তাঁরা। অনেক আলোচনার পর ঠিক করলেন যে একটি বৈজ্ঞানিক অভিযানের সাহায্যে এই অজানা সংকেতের রহস্য উদ্ঘাটন করতে হবে। গ্রহমণ্ডল সরকারও মেনে নিয়েছেন এই প্রস্তাব।'

হলঘরে সমবেত বিজ্ঞানীরাও সমর্থন করলেন বিজ্ঞান আকাদামীর এই প্রস্তাবকে। কেউ কেউ এটাকে শতাব্দীর সুযোগ বললেন, কেউ কেউ বললেন যে হলদে তারাতে যদি জীবনের বিকাশের পরিবেশ থাকে তা হলে অনায়াসেই সেটাকে সৌরমণ্ডলের কলোনীতে পরিণত করা যেতে পারে। জনসংখ্যার সঙ্কোচের জন্য গ্রহমণ্ডল সরকার যে কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন সে টাকাটা প্রযুক্তি বিজ্ঞানের উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা যেতে পারে।

জ্ঞানবৃদ্ধ বিজ্ঞানীদের আলোচনা শুনে মুচকি মুচকি হাসছিল ব্যোমব্রহ্ম, বলল,—'আগে দেখুন ব্যাপারটা কি। আপনারা দেখছি গাছে কাঁটাল গোঁপে তেলের ব্যবস্থা করছেন! আমরা সবাই সূর্য-রশ্মিতে স্নাত, হলদে তারার বিকিরণ বলয় সম্পর্কে কিছুই জানি না, কাজেই আগে থেকে অতটা আশাবাদী হওয়া ঠিক হচ্ছে না।'

মাথা নেড়ে ব্যোমব্রহ্মের কথার সমর্থন জানালেন ডক্টর গুণবর্ধন, বললেন,—'আপনার এই তীক্ষ্ণ বাস্তব বুদ্ধির জন্যই বিজ্ঞান আকা-

দামীর সভাপতি মাদাম তেরেস্কোভা বেছে নিয়েছেন আপনাকে। স্পেস-কম্যাণ্ডারদের মধ্যে আপনিই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, দুঃসাহসিক ও অভিজ্ঞ। কোনো মৃত তারা বা গ্রহে অভিযান চালাবার তুলনায় বুদ্ধিমান প্রাণী অধ্যুষিত গ্রহ বা তারায় নামবার ঝুঁকি অনেক বেশী। সামান্য ভুলের জন্য সব কিছু বানচাল হয়ে যেতে পারে, জীবন বিপন্ন হ'তে পারে অভিযাত্রীদের, এমন কি মহাকাশ-যানও ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আশা করি আপনি এই দুরূহ ও বিপদ সঙ্কুল কাজের ভার নিতে ইতস্ততঃ করবেন না।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ব্যোমব্রহ্ম, মাথা নুইয়ে সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে বলল,—'আমি আনন্দে এই বিজ্ঞান-অভিযানের দায়িত্বভার নিতে প্রস্তুত ডক্টর গুণবর্ধন।'

উপস্থিত গণ্যমান্য বিজ্ঞানীরা হর্ষধ্বনি করে উঠলেন, ডক্টর গুণবর্ধন গভীর আবেগে ব্যোমব্রহ্মের হাত জড়িয়ে ধরলেন, বললেন,—'খুব খুশী হ'লাম স্পেস-কম্যাণ্ডার। বসুন, আমার বাকী বক্তব্যটুকু সংক্ষেপে শেষ করে নিই।'

ব্যোমব্রহ্ম নিজের চেয়ারে বসে পড়ল, ডক্টর গুণবর্ধন বলতে লাগলেন,…'এবার হলদে তারা সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা বলছি। শেষ সঙ্কেতটা পাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের অবজারভেটারীর ইলেক্ট্রনিক টেলিভিসোস্কোপ তার উৎস এই হলদে তারাটিকে খুঁজে বার করেছে। ঐ পরদার দিকে তাকালে দেখতে পাবেন যে গ্যালাক্সীর কেন্দ্র থেকে বহু আলোকবর্ষ দূরে ক্রুগার-৬০ নামে একটি যুগ্ম তারা আছে! এই যুগ্ম তারা আর গ্যালাক্সীর কেন্দ্রকে একটি সরলরেখায় যোগ করে ক্রুগার-৬০ থেকে ৫৫ ডিগ্রী ৩৫ মিনিট ২২ সেকেণ্ড কোণ করে এই যে রেখা, তার ওপর ০·৫ আলোকবর্ষ দূরে আমাদের হলদে তারাটি অবস্থিত। খুব সম্ভব তারাটি মৃত এবং অন্য কোনো তারার আলোয় আলোকিত। আপনারা জানেন যে আমাদের গ্যালাক্সীর সমস্ত তারাই কেন্দ্রের চারপাশে আবর্তিত হচ্ছে। সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে আমাদের সূর্যও ঐ কেন্দ্রের চারদিকে

ঘুরছে, তাতে সময় লাগে পার্থিব ২৫ কোটি বছর। একে বলা হয় এক গ্যালাকৃটিক বছর। যাই হোক, এই আবর্তনের ফলে তারাদের মধ্যকার দূরত্বের বা অবস্থানের কোন পরিবর্তন ঘটে না। কাজেই স্পেস-কম্যাণ্ডার যদি এই ম্যাপ অনুসারে তাঁর যাত্রাপথ কম্পিউট্ করেন, তা হলে লক্ষ্যে পৌঁছতে কোনো অসুবিধা হবে না।'

ডক্টর গুণবর্ধন থামলেন। পিয়ের লোটি স্ক্রীনের কাছে গিয়ে একটি নকশা নিয়ে এলেন, স্পেস-কম্যাণ্ডার ব্যোমব্রহ্মের হাতে দিলেন।

একটি রবট ঘরে ঢুকলো, তার হাতে মস্ত বড় ট্রে। ট্রের ওপর সারি সারি পেয়ালা ভরতি "জুম"। এক ধরনের সামুদ্রিক উদ্ভিদের নির্যাস থেকে তৈরী "জুম" এর খুবই চাহিদা আছে আন্তর্গ্রহ বাজারে।

টেবিলের ওপর ট্রে নামিয়ে রেখে প্রত্যেককে এক এক পেয়ালা জুম পরিবেশন করে গেল অবজারভেটারীর রবট।

জুম-এর পেয়ালায় চুমুক দিয়ে ব্যোমব্রহ্ম বলল,—'বহুদিন পরে জুম খাচ্ছি, অনেক ধন্যবাদ ডক্টর গুণবর্ধন।'

একটু হেসে ডক্টর গুণবর্ধন বললেন,—'ভাববেন না স্পেস-কম্যাণ্ডার আপনার স্পেস-শিপে প্রচুর পরিমাণে জুম দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই অতি আধুনিক স্পেস-শিপে সব রকমের স্বাচ্ছন্দ্য আর আরামের ব্যবস্থা থাকবে।'

পিয়ের লোটি বললেন,—'মার্কোসাপলাস থেকে কিছু বৈজ্ঞানিক স্পেসিমেন আনা চাই কিন্তু স্পেস-কম্যাণ্ডার।'

'মার্কোসাপলাস ? তার মানে ?

মৃদু হেসে ডক্টর গুণবর্ধন বললেন,—'আমরা ঐ হলদে তারার নাম রেখেছি মার্কোসাপলাস। বৃহস্পতির বিখ্যাত জোতির্বিজ্ঞানী মার্কোসাপলাসের নামে নামকরণ করা হয়েছে। জীবন ভার মহাকাশের অন্য কোনো তারায় জীবনের উদ্ভব সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে গেছেন তিনি।'

জুম-এর পেয়ালা খালি করে শূন্য পেয়ালাটা ট্রের ওপর নামিয়ে রাখল ব্যোমব্রহ্ম। বলল,—'বেশ করেছেন, এবার অভিযান সম্পর্কে কিছু বলুন।'

'হ্যাঁ বলি'—'ব'লে আবার উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর গুণবর্ধন,—'প্রথমেই মার্কোসাপলাস অভিযানের অভিযাত্রীদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। ইনি হলেন বুধগ্রহের মেয়ে কুমারী টিম্বালটিয়া, জ্যোতিপদার্থ বিজ্ঞানে ডক্টরেট।'

দ্বিতীয় অভিযাত্রীকে দেখিয়ে দিয়ে ডক্টর গুণবর্ধন বললেন,—'ইনিও বুধের মেয়ে জোম্বালজিয়া। ইনি জ্যোতিচিকিৎসক।'

বুধের মেয়ে দুটি উঠে দাঁড়ালো, খাঁটি বুধ প্রথায় অভিবাদন জানালো ব্যোমব্রহ্মকে। ওদের গভীর নীল রং, ঘড়ির মতো চ্যাপ্টা মুখ, প্রকাণ্ড মাথা, চারটে চোখ, চ্যাপ্টা নাক, মাথা থেকে বেরিয়ে আসা লম্বা এ্যানটেনা আর টেলিস্কোপিক হাত-পা দেখে বার বার বোম্বালভিয়ার কথা মনে পড়ছিল ব্যোমব্রহ্মের, মনে পড়ছিল তার চিঠির কথা।

পার্শ্ববতী অভিযাত্রীকে দেখিয়ে ডক্টর গুণবর্ধন বললেন,—'ইনি মঙ্গলগ্রহের নৃতত্ত্ববিদ ডক্টর বি-মা। এঁর আর একটা গুণও আছে, ইনি এ্যাসট্রানেভিগেশনেও দক্ষ। দীর্ঘ মহাকাশ পাড়ি দেবার সময়ে আপনাকে ইনি সাহায্য করতে পারবেন।'

গাছ-মানুষ বি-মা মাথা নেড়ে অভিবদান জানালেন ব্যোমব্রহ্মকে। বললেন,—'আপনার নেতৃত্বে দীর্ঘ মহাকাশ পরিক্রমার স্বপ্ন আমার বহুদিনের, স্পেস-কম্যাণ্ডার এতদিনে আমার সে স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে। আমি আনন্দিত, খুবই আনন্দিত।'

চতুর্থ প্রাণীর দিকে তাকিয়ে ডক্টর গুণবর্ধন বললেন,—'ইনি বৃহস্পতির তু'নম্বর চাঁদের জীব বিজ্ঞানী ডক্টর চু-গা। সেম্প-শিল্প ইঞ্জিনীয়ারিংয়েও ডিগ্রী আছে ওঁর। মার্কোসাপলাসে যদি কোন বুদ্ধিমান জীব সত্যিই থাকে তা হলে ডক্টর বি-মার সহযোগিতায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাবেন ইনি, সম্ভব হ'লে ওখানকার কোনো প্রাণীকে এখানে নিয়ে আসবেন আরও ব্যাপক পরীক্ষার জন্য।'

দশ ফুট লম্বা বিচিত্র জীব চু-গা উঠে দাঁড়ালেন। মোষের শিং এর মতো বাঁকানো, কিন্তু তার চেয়ে চারগুণ বড় একটা মজবুত এ্যানটেনা

মাথার ওপরে থাকায় তাঁকে আরো লম্বা দেখাচ্ছিল। গায়ের রং টকটকে লাল। মুখখানা বন্য বরাহের মতো লম্বাটে থুতনি ছুঁচলো। ভুরুহীন তিনটে চোখে অসম্ভব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। চু-গা বললে,—'মহাকাশে চলতে চলতে স্পেস-শিপের কোনো কলকব্জা যদি হঠাৎ বিগড়ে যায়, তা হলে নিশ্চিন্ত মনে তার ভার আমার ওপর ছেড়ে দেবেন স্পেস-কম্যাণ্ডার। আমি সব ঠিক করে দেব। গত বছর প্লুটো থেকে ইউরেনিয়াম আনবার জন্য স্পেশাল স্পেস-কনভয় গিয়েছিল, আমি তার নেতৃত্ব করেছিলাম। এতদিন আপানার নামই শুনেছি, এবার চাক্ষুষ দেখা পেয়ে খুশী হলাম।'

পঞ্চম জনের দিকে হাত বাড়িয়ে ডক্টর গুণবর্ধন বললেন,—'ইনি শুক্রগ্রহের এ্যাস্ট্রো ডঃ সং-লা।'

মাত্র দুই ফুট লম্বা শুক্রগ্রহের প্রাণীটি তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে ছুটে এলো ব্যোমব্রহ্মের কাছে। গায়ের রং ঘন সবুজ, কিন্তু তাপের পরিবর্তনের সঙ্গে সে রং পালটায়। বধুগ্রহের প্রাণীর মতোই গোল চ্যাপ্টা মুখ, মাথা পর্বতচূড়ার মতো সরু হয়ে গেছে। এঁরও. টেলিস্কোপিক হাত পা,—ইচ্ছে মতো ছোট বড় করা চলে। হাত চেপে ধরলেন সং-লা, বললেন,—'এই অভিযানে আমারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে স্পেস-কম্যাণ্ডার! মার্কোসাপলাসের ভূ-প্রকৃতি, ও অন্যান্য বিষয়ে সব কিছু জেনে আসাই হবে আমার কাজ। এ বিষয়ে আমাকে সাহায্য করবেন ডক্টর টিম্বালটিয়া। আমরা দু'জনে মিলে একটি টীম।'

সাবার শেষে যিনি বসেছিলেন তাঁকে দেখিয়ে ডক্টর গুণবর্ধন বললেন, —'ইনি শনির বলয়ের প্রখ্যাত ধাতুবিজ্ঞানী ডক্টর জা-রো। এঁর কাজ হবে গ্রহমণ্ডলে পাওয়া যায় না এ রকম ধাতুর সন্ধান করা। যদি পাওয়া যায় তা হ'লে স্পেস-শিপের খোলে ভরে নিয়ে আসতে হবে প্রচুর পরিমাণে যাতে অভিযানের বিপুল খরচের অনেকটাই উঠে আসে।'

শনির বলয়ের যে প্রাণীটি ব্যোমব্রহ্মের কাছে এসে মাথার ওপর হাত তুলল তার চেহারার সঙ্গে কম্যাণ্ডান্ট বিলিং-এর যথেষ্ট সাদৃশ্য

লক্ষ্য স ব্যোমব্রহ্ম। সেই হাতির শুঁড়ের মতো লম্বা নাক, প্রকাণ্ড বিশাল চোখ···

অভিযাত্রীরা সবাই ব্যোমব্রহ্মের দিকে তাকিয়ে ছিল। ব্যোমব্রহ্ম বুঝল যে এখন তার পক্ষে কিছু বলা উচিত। উঠে দাঁড়ালো সে, সবার মুখের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলতে লাগলো,—'গ্রহ-মণ্ডল বিজ্ঞান আকাদামী বিভিন্ন গ্রহ থেকে শ্রেষ্ঠ বিশেষজ্ঞ দল বাছাই করেছেন এই অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ গভীর মহাকাশ অভিযানের জন্য। এই অভিযানের নেতা নির্বাচিত হবার জন্য আমি গর্বিত। আশা করছি যে আপনাদের সহযোগিতায় যে কোনো সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারব।'

অভিযাত্রীরা হর্ষধ্বনি করে উঠল।

ব্যোমব্রহ্ম বলতে লাগল,—'কিন্তু তাই বলে সঙ্কটকে ছোট ক'রে দেখলে চলবে না। এতদিন আমরা জীবহীন নিষ্প্রাণ গ্রহ বা তারায় বিভিন্ন অভিযান চালিয়েছি। তাতে কোনো বিপদের আশঙ্কা ছিল না। একবার এ্যাণ্ড্রোমিডাসের কাছাকাছি একটা তারায় আমরা উদ্ভিদের সন্ধান পেয়েছিলাম। খুবই নিম্ন স্তরের উদ্ভিদ ওরা, মনে হ'ল যে লক্ষ লক্ষ বছর পরে ঐ তারায় হয় মঙ্গলের মতো মহাবুদ্ধিমান গাছ-মানুষ বা সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের মতো বুদ্ধিমান প্রাণীর উদ্ভব হবে বির্বর্তনের আমোঘ নিয়মে। ঐ তারাতেও আমাদের কোনো বিপদের আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু মার্কোসাপলাসের কথা আলাদা। ওখানকার প্রাণীরা কেমন্ তা আমরা জানি না, কিন্তু তারা যখন এ্যাটমিক এনার্জি উৎপাদন করবার কৌশল আয়ত্ত করেছে তখন অসাধারণ বুদ্ধিমান নিশ্চয়ই। তারা মহাকাশে সঙ্কেত ছড়িয়ে দিচ্ছে কেন তা আমরা জানি না, হয়তো কোনো বিপদে পড়ে সাহায্য চায় তারা, হয়তো অন্য কোনো কারণে মহাকাশের অপর কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়। তারা আমাদের মিত্রও হতে পারে, শত্রুও হতে পারে। আমাদের সব রকমের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সমস্ত সৌরজগৎ আমাদের

এই দুরূহ অভিযানের দিকে তাকিয়ে থাকবে। তবে আমরা তাদের নিরাশ করব না, জয়ী হয়েই ফিরে আসব।'

বিভিন্ন গ্রহ থেকে আসা অভিযাত্রীদল একযোগে হর্ষধ্বনি করে উঠলেন। হর্ষধ্বনি ক'রে উঠলেন ডক্টর গুণবর্ধন আর পিয়ের লোটি।

ব্যোমব্রহ্ম বসে পড়ল। ডক্টর গুণবর্ধন বললেন,—'স্পেস-কম্যাণ্ডার সব কথাই বেশ গুছিয়ে সংক্ষেপে বলেছেন। আমার তরফ থেকে আর একবার বলছি যে মার্কোসাপলাসে নেমে আপনারা যদি কোনো বুদ্ধিমান প্রাণীর দেখা পান তা হ'লে সমগ্র গ্রহমণ্ডলের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে তাঁদের শুভেচ্ছা জানাবেন। মনে রাখবেন, আমরা চাই প্রীতি, সখ্য আর মৈত্রী। বহুদূরের ঐ বুদ্ধিমান প্রাণীরা দেখতে কেমন জানি না, জানি না তাদের আচার আচরণ বা স্বভাব কেমন, তবু তাদের সঙ্গে আমরা ভালোবাসার সম্পর্কই স্থাপন করতে চাই। এটাই গ্রহমণ্ডল সরকারের বিঘোষিত নীতি।'

ব্যোমব্রহ্ম বলল,—'তা আমি জানি ডক্টর গুণবর্ধন, কিন্তু ব্যাপারটা পুরোপুরি ভাবে আমাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া ভালো।'

'তার মানে ?'

'মানে, যদি ঐ বুদ্ধিমান প্রাণীরা আমাদের সদিচ্ছার মর্যাদা না দেয়, হঠাৎ যদি আক্রমণ করে বসে, তা হলে বাধ্য হয়ে আমাদের প্রত্যাঘাত করতেই হবে, প্রয়োজন হলে মারণাস্ত্রও প্রয়োগ করতে হবে।'

'মারণাস্ত্র ?'

"নিশ্চয়ই। সর্বাধুনিক মারণাস্ত্র না নিয়ে কোনোমতেই যাওয়া চলবে না। মনে রাখবেন আমাদের জ্ঞানের সীমানার বাইরে এক অজানা তারায় যাচ্ছি আমরা। কোন ভয়ঙ্কর বিপদ ওখানে লুকিয়ে আছে তা কেউ জানে না। আমার ওপর থাকছে এতজন সেরা বিজ্ঞানীর শুভাশুভের ভার, ওঁদের ভালোভাবে ফিরিয়ে আনাটাই আমার প্রধান দায়িত্ব। এ অবস্থায় বিধ্বংসী মারণাস্ত্র ছাড়া এক পা-ও নড়া চলে কি ডক্টর গুণবর্ধন ?'

বেশ কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন ডক্টর গুণবর্ধন, মনে মনে ব্যোমব্রহ্মের যুক্তিটা পর্যালোচনা করতে লাগলেন। পিয়ের লোটি তাঁর কানে কানে বললেন,—'স্পেস-কম্যাণ্ডার ঠিক কথাই বলেছেন ডক্টর গুণবর্ধন, আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ছাড়া এই অভিযানে রওনা হওয়াই চলে না।'

অভিযাত্রীরা পরস্পরের মুখে তাকাতে লাগলেন।

ডক্টর গুণবর্ধনের ভাবনাটা অবশ্য অকারণ নয়। ২৫৭০ খৃষ্টাব্দে পৃথিবী ও সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ থেকে যুদ্ধের ভয়াবহ স্মৃতি একেবারেই মিলিয়ে গিয়েছিল। চারদিকে শুধু শান্তির আবহাওয়া। নতুন শতাব্দীর সাধারণ মানুষ ও গ্রহান্তরের প্রাণীরা জানতোই না যুদ্ধ কাকে বলে, মারণাস্ত্র কী জিনিস। জানতোই না আঘাতের বদলে কি করে প্রত্যাঘাত হানতে হয়! একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন স্পেস-কম্যাণ্ডাররা। তাঁদের প্রায়ই দূর দূরান্তরে নানা বিঘ্ন সঙ্কুল অভিযানে যেতে হ'ত ব'লে অতি আধুনিক মারণাস্ত্রের প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হ'ত। আর তা দেওয়া হ'ত আন্তর্গ্রহ সেনাবাহিনীকে। গভীর মহাকাশ থেকে যাতে কোনো অতর্কিত আক্রমণ নেমে না আসে সে জন্যই এই ব্যবস্থা।

অনেকক্ষণ চিন্তার পর একটা নিশ্বাস ফেললেন শান্তিবাদী ডক্টর গুণবর্ধন, পিয়ের লোটির মুখে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললেন,—'তবে তাই হোক। আমরা তো আর সমগ্র অভিযানটা বিপর্যস্ত হবার ঝুঁকি নিতে পারি না! তুমি গ্রহমণ্ডল সরকারকে স্পেস-কম্যাণ্ডারের দাবির কথাটা জানিয়ে দাও।'

মাথা নেড়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ডক্টর পিয়ের লোটি।

ব্যোমব্রহ্মের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল, বলল,—'এবার আমাদের প্রোগ্রামটা বলুন ডক্টর গুণবর্ধন।'

ডক্টর গুণবর্ধন যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন, লক্ষ্য করলেন যে শুধু ব্যোমব্রহ্ম নয়, বিজ্ঞানী অভিযাত্রীরাও তাঁর মুখে তাকিয়ে আছে। মনের ভাবনাগুলো ঝেড়ে ফেলে ব'লে উঠলেন, 'ও হ্যাঁ

আপনাদের প্রোগ্রাম। সবকিছুই পাকাপাকি ভাবে ঠিক ক'রে ফেলা হয়েছে। আপনারা সবাই দীর্ঘ অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছেন তো ?'

অভিযাত্রীরা সমস্বরে বললেন,—'হ্যাঁ।'

বাঃ, চমৎকার। আপনাদের রওনা হ'তে হবে আজ রাত্রের খাবার পরেই। অবজারভেটারী থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে সাটল রকেট বেস-স্টেশন ক্রুম্পা। সেখান থেকে সাটল রকেটে চেপে প্রথমেই আপনারা যাবেন স্পেস-স্টেশন এফ—৭২০তে। স্পেস-স্টেশন এফ—৭২০ পৃথিবী ও মঙ্গলের মাঝমাঝি জায়গায় থেকে মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করছে। ওখানকার ডিরেক্টার বুধ-কুমারী বোম্বালভিয়ার নাম আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন। মার্কোসাপলাস অভিযানের ব্যবস্থার ভার তাঁর ওপরেই দেওয়া হয়েছে। ম্যাগ্‌নেটোভিসোস্কোপে এই অভিযানের পুরো পরিকল্পনাটাই তাঁর কাছে পৌঁছে গেছে দিন কয়েক আগে। দূর পাল্লার যাত্রার জন্য স্পেস-স্টেশন ব্যবহার করাই সুবিধাজনক। এতে আণবিক জ্বালানীও কম লাগে, বিপদের ঝুঁকিও থাকে না। এ জন্যই স্পেস ডিপার্টমেণ্ট এই ব্যবস্থা করেছেন।'

বোম্বালভিয়া ? কী অদ্ভুত যোগাযোগ ? আজই কিছুক্ষণ আগে বোম্বালভিয়ার চিঠি পেয়েছে সে স্পেস ডাকে, আর আজই আবার বোম্বালভিয়ার কাছে যাবার সুযোগ পাওয়া গেল! ব্যোমব্রহ্মার ধমনীতে রক্তস্রোত তীব্র হ'ল, মন ভরে উঠল আনন্দে।

তীক্ষ্ণ চোখে ব্যোমব্রহ্মের রক্তাভ মুখে তাকালেন ডক্টর গুণবর্ধন, হয়তো ভাবলেন যে আসন্ন অভিযানের কল্পনায় উত্তেজিত হয়ে উঠেছে স্পেস-কম্যাণ্ডার ব্যোমব্রহ্ম। বললেন,—'আর কিছু জানাতে চান আপনি ?'

'হ্যাঁ, ক্রুম্পায় পৌঁছুবার জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়েছে ?'

'এ তো সামান্য ব্যাপার। অবজারভেটারীর ছাতে দু'খানা হেলিকপ্টার ট্যাক্সি ডাকা হয়েছে, আপনাদের সব্বার মালপত্র তোলা হয়েছে। আপনাদের খাওয়া শেষ হলেই উঠবেন গিয়ে তাতে।'

'তা হলে আর দেরী ক'রে কী হবে, খাওয়া-দাওয়ার পাটটা চুকিয়ে ফেলা যাক। খিদেও পেয়েছে মন্দ না।'

স্পেস-কম্যাণ্ডারের শেষ কথাটা শুনে হেসে ফেলল বুধ-সুন্দরী দু'জন। স্মিত-হাস্যে ডক্টর গুণবর্ধন বললেন,—'তাই নাকি ? এটা কিন্তু টেরাডেলফিউগোর জল হাওয়ারই গুণ। আসুন আমার সঙ্গে।'

প্যাসেজ থেকে লিফটে চেপে নীচের ডাইনিং রুমে এলো সবাই। বিরাট হল, বিশাল ডাইনিং টেবিল, এক সঙ্গে একশ'জন লোক খেতে পারে সেখানে। বৃহস্পতির পাথর দিয়ে মোজেইক করা মেঝে,—ভেতর থেকে যেন আলো ফুটে বার হচ্ছিল। ঢেউ খেলানো দেওয়ালগুলো উজ্জ্বল ঝকঝকে। আলোর উৎস দেখা যাচ্ছিল না, অথচ চারদিক দ্যুতিময়। দেওয়ালে দেওয়ালে বিভিন্ন গ্রহের প্রখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবি। কোত্থেকে যেন গানের সুর ভেসে আসছিল, যেমন মিষ্টি, তেমনি নরম। অবজারভেটারীর স্টাফ, আর অভিযাত্রী দল এক সঙ্গে খেতে বসল। ডক্টর গুণবর্ধনের ইঙ্গিতে ভোজসভার প্রধান আসনটিতে বসল ব্যোমব্রহ্ম, তার ডান পাশে ডক্টর গুণবর্ধন আর বাঁ পাশে পিয়ের লোটি। বাকী আসনগুলিতে ছয় জন বিজ্ঞানী অভিযাত্রী আর ছয় জন অবজারভেটারীর বিজ্ঞানী বসলেন। সাধারণ ভোজসভাগুলিতে রবটরাই খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন করে থাকে, কিন্তু এই বিশেষ ভোজসভার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করেছিলেন অবজারভেটারীর কর্তৃপক্ষ। প্রত্যেকটি অতিথির সামনে বিশেষ বোর্ডে আন্তর্গ্রহ ভাষায় লেখা মেনু ছিল। প্রত্যেকটি খাবারের নামের পাশে ছোট ছোট বোতাম। বোতাম টেপা মাত্র নির্দিষ্ট খাবারটি টেবিলে এসে উপস্থিত হচ্ছিল।

একটু হেসে ব্যোমব্রহ্ম বলল, 'প্রাচীন ইতিহাসে পড়েছি যে বিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমবঙ্গ নামে একটা ছোট জায়গায় "আপরুচি খানা" বলে একটা প্রবাদ প্রচলিত ছিল। তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হচ্ছে আজকের এই ভোজসভা। ডক্টর সং-লার খাদ্য অভ্যাসের সঙ্গে ডক্টর চু-গার আকাশ-পাতাল তফাৎ, তেমনি তফাৎ বুধ-কুমারী টিম্বালটিয়ার খাদ্যা-

ভ্যাসের সঙ্গে ডক্টর জা-রোর। আমার সঙ্গে ডক্টর বি-মার খাদ্যাভ্যাসেরও কোনো মিল নেই। অথচ দেখুন আমরা সবাই একই টেবিলে বসে নিজের নিজের গ্রহের সেরা খাবার খাচ্ছি। কোনো গোলমাল হচ্ছে না কোথাও।'

ব্যোমব্রহ্মের সরস মন্তব্যে হেসে উঠলো সবাই। 'জুম'-এর গ্লাস উঁচুতে তুলে ধ'রে জোম্বালজিয়া বললেন,—'আসুন আমরা এ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক অভিযানের সাফল্য কামনা করি।'

সঙ্গে সঙ্গে এক সঙ্গে অনেকগুলো 'জুম'-এর গ্লাস উর্ধ্বে উত্তোলিত হ'ল, একই সঙ্গে নিঃশেষিত হ'ল।

দশ কিলোমিটার স্কয়ার জুড়ে সাটল রকেট বেসস্টেশন ক্রুম্পা। নিয়মিত দূরত্বের ব্যবধানে একশ তলা উঁচু লন্‌চিং প্ল্যাটফর্মগুলোর মাথায় লাল নীল হলদে সবুজ—নানা রং-এর আলো জ্বলছিল। মাঝে মাঝেই যান্ত্রিক কণ্ঠ সাটল রকেট ছাড়বার সময় এবং তার গন্তব্যস্থান সম্পর্কে ঘোষণা করে চলছিল আন্তর্গ্রহ ভাষায়। ব্যোম-ব্রহ্মদের নিয়ে হেলিকপ্টার ট্যাক্সি বেস-স্টেশন থেকে দুই কিলোমিটার দূরে নামল। এই গণ্ডী ছাড়িয়ে কোনো উড়ন্ত যানের ভেতরে ঢোকা নিষিদ্ধ। ব্যোমব্রহ্মরা নামতে না নামতেই—একটি সাটল রকেট স্পেস-স্টেশন কে ২০৫-এর দিকে রওনা হ'য়ে গেল। অগ্ন্যুৎপাতের মতো বিপুল আলোর ঝলক ওদের চোখ ধাঁধিয়ে দিল, কিছুক্ষণ পরেই শুনতে পেল শ'খানেক বাজ পড়ার আওয়াজ, যা অবশ্য হেলিকপ্টারের সাউণ্ড-ফিলটার যন্ত্রের ভেতর দিয়ে আসার ফলে বেশ মোলায়েমই হয়ে গিয়েছিল।

—হেলিকপ্টার-ট্যাক্সি অবতরণ ক্ষেত্রের কাছে একটি চাপ নিয়ন্ত্রিত দ্রুতগামী গাড়ি অপেক্ষা করছিল। তাতে চেপে মার্কোসাপলাস-অভিযাত্রী দল যখন ক্রুম্পায় এসে পৌঁছুল তখন রাত এগারোটা পঞ্চাশ। যান্ত্রিক কণ্ঠের ঘোষণা শুনে ব্যোমব্রহ্ম বুঝল যে তাদের বিশেষ সাটল রকেটটি ছাড়বে ছয় নম্বর লন্‌চিং প্লাটফর্ম থেকে রাত

বারোটায়। বেস-স্টেশনের লোকেরা এসে অভিযাত্রীদের মালপত্র কনভেয়ার যোগে আগেই পাঠিয়ে দিল সাটল রকেটে। ব্যোমব্রহ্মের নেতৃত্বে অভিযাত্রীরা ছয় নম্বর লনচিং প্ল্যাটফর্মের পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল। কৃত্রিম চাঁদের কৃপায় আলোর কোনো অভাব নেই, তা ছাড়া শত শত বোরন ল্যাম্প তো জ্বলছিলই। অনেক দূরে পশ্চিমের আকাশ হঠাৎ তীব্র আলোর ছটায় দ্যুতিময় হয়ে উঠলো। ব্যোমব্রহ্ম বুঝল যে আর একটি সাটল রকেট রওনা হয়ে গেল কোন্ এক স্পেস-স্টেশনের দিকে।

লন্‌চিং প্ল্যাটফর্মের লিফট নেমে এলো। গাদাগাদি করে তার ভেতরে ঢুকে গেল ওরা সাতজন। অভিযানের প্রথম ধাপ এটা, সবাই অল্পবিস্তর উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। বুধ গ্রহের মেয়ে দুটির মুখ উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল, ঝলমল করছিল বি-মা, সং-লা, চু-গা, আর জা-রোর মুখ। ব্যোমব্রহ্ম শুধু আবেগহীন। হালকা উচ্ছ্বাস ওর ধাতে নেই।

সাঁ সাঁ করে ওপরে উঠে গেল লিফট, থামল গিয়ে লন্‌চিং প্ল্যাটফর্মের চূড়াতে। সেখানেই দীর্ঘপথ পাড়ি দেবার জন্য এক্সপ্রেস জাতীয় সাটল রকেটটি তৈরী হয়েছিল।

ভেতরে ঢুকতে যাবে, এমন সময় বেস-স্টেশনের অধ্যক্ষ এগিয়ে এলেন ব্যোমব্রহ্মের দিকে, অভিবাদন জানিয়ে বললেন,—'এই এক্সপ্রেস অবশ্য আপনাদের জন্যই চার্টার করা হয়েছে তবে আপনার যদি আপত্তি না থাকে তা হলে দুটি ছাত্র-ছাত্রীকে যাত্রী হিসেবে নিতে চাই। বড্ড ধরেছে ওরা আমাকে।'

অবাক হয়ে ব্যোমব্রহ্ম বলল,—'কোথায় যাবে ওরা ?'

'যেখানে আপনারা যাচ্ছেন, সে স্পেস-স্টেশন এক—৭২০ তে।'

'সে কি ? এখন তো বেড়াতে যাবার সিজন নয় ?'

'তা জানি। সিজন টাইমে হোটেলে জায়গা পায়নি ওরা, তাই অফ সিজনে যাচ্ছে।'

'তাই নাকি ? কে ওরা ?'

'একজন মহাকাশ গবেষণার রিসার্চ স্কলার বিলাসিতা ফার্গুসন, অন্যজন আন্তর্গ্রহ সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্র নিকোলাই নিজিনিস্কি—' বলে গলাটা একটু নামিয়ে বললেন,—'প্রেমে পড়া যুবক-যুবতী। খুব সম্ভব সাটল রকেটেই বিয়েটা সেরে নেবে তার পরে স্পেস-স্টেশন এক—৭২০ তে মধুচন্দ্রিমা যাপন করবে।'

হেসে উঠলো ব্যোমব্রহ্ম, বলল 'কোথায় ওরা ?'

'ঐ যে, ঐ কোণে দাঁড়িয়ে গল্প করছে দু'জন।'

ব্যোমব্রহ্মের হাসির শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে এদিকে তাকালো দু'জন, তারপরে এগিয়ে এলো। চমৎকার পেয়ার, মনে মনে ভাবল ব্যোমব্রহ্ম, সুন্দর ফিগার, বুদ্ধির পার্সেণ্টেজ পঁয়ষট্টি।

ওরা কাছে এসে ব্যোমব্রহ্মের অনুমতি চাইলো বিনীতভাবে। ব্যোমব্রহ্ম বলল,—'ঠিক আছে, চলো। কিন্তু নির্জন স্পেস-স্টেশনে বেশীদিন ভালো লাগবে না, তা-ও বলে দিচ্ছি।'

ওরা নীরবে পরস্পরের মুখে তাকালো। নম্র, মধুর হাসি ফুটে উঠলো ওদের মুখে, সেই হাসি যেন বলতে চাইলো,—'আমরা দু'জন সব নির্জনতা ভরে রাখবো পরস্পরকে সঙ্গ দিয়ে।'

সাটল রকেট ছাড়বার সময় হয়ে এসেছিল। আর দেরী না করে ভেতরে ঢুকে গেল সবাই। হাইড্রলিক ব্রেকের সাহায্যে রকেটের দরজা নিশ্ছিদ্রভাবে এঁটে বন্ধ হ'য়ে গেল। কেবিনের ভেতরে সবুজ বাতি জ্বলে উঠলো। সামনেই কনট্রোল প্যানেল আর ইঞ্জিন রুম। সেখানে রবট চালক তৈরী হ'য়ে বসে ছিল। সবাই নিজের নিজের আসনে বসামাত্র স্বয়ংক্রিয় হ'য়ে উঠলো, নিজের নিজের আসনের সঙ্গে মজবুতভাবে সেঁটে গেল সবাই।

ঠিক বারোটার সময়ে 'বুম' ক'রে একটা প্রচণ্ড আওয়াজ হ'ল ; মেঘের গায়ে তীব্র আলোর ঝলক লাগলো, সাটল রকেট সেকেণ্ডে হাজার মাইল বেগে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হ'ল। কনট্রোল প্যানেলে কম্পিউটার মেশিনের ডায়ালে থরেরী রং-এর আলো জ্বলে উঠল। প্লেনেটারী মোটরগুলো চালু হ'ল কিছুক্ষণ পরে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান

ছাড়িয়ে বিপুল শূন্যে ছুটতে লাগলো সাটল রকেটটা। তখন তার গতিবেগ বেড়ে হ'ল সেকেণ্ডে দশ হাজার মাইল।

যাত্রীদের কেবিনের সামনে স্পেকট্রা-স্পেসোস্কোপের পরদায় বাইরের মহাকাশের ছবি ফুটে উঠছিল। অলফা সেণ্টুরী আর প্রকসিমা সেণ্টুরীর তারাগুলো নিকষ কালো মহাকাশের ভেলভেটে হীরের পিনের মতো জ্বলছিল। ধূলিমুক্ত আর হাওয়ায় তাদের চেহারাই পালটে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ আগেই চাঁদকে পেছনে ফেলে রেখে এসেছে তারা, তাই চাঁদের ছায়া আর পড়ছিল না স্পেকট্রা-স্পেসোস্কোপের পরদায়।

প্রণয়ী যুগল বিলাসিতা আর নিকোলাইর বোধ হয় এই প্রথম স্পেকট্রা-স্পেসোস্কোপের পরদার দিকে তাকিয়েছিল। বিলাসিতা মহাকাশ গবেষণা করে, মাঝে মাঝে মৃদুকণ্ঠে তারা চিনিয়ে দিচ্ছিল নিকোলাইকে। পাশাপাশি সিটে বসেছিল ওরা, নিকোলাইর কাঁধে মাথা রেখে কথা বলছিল বিলাসিতা। নিকোলাই মাঝে মাঝে বিলাসিতার চোখের গভীরে তাকাচ্ছিল, হয়তো ভাবছিল যে দুটি চোখের তারার গভীরতা আর ব্যাপ্তির কাছে আকাশের হাজার তারাও তুচ্ছ।

টিম্বালটিয়া, জ্যোম্বালজিয়া, বি-মা, চু-গা, সং-লা আর জা-রো এর আগে বহুবার মহাকাশ ভ্রমণ করেছেন, তাই কিছুই নতুন লাগছিল না তাঁদের কাছে। প্রণয়ী যুগলের প্রণয় লীলাই বেশী উপভোগ করছিলেন তাঁরা। প্রেমিকরাই পারে পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে এমন অনবহিত হয়ে নিজেদের নিয়ে মগ্ন থাকতে! খ্যাতনামা বিজ্ঞানী হলেও যৌবন পার হয়ে যায়নি তাঁদের, বিশুদ্ধ বিজ্ঞান চর্চার ফাঁকে ফাঁকে জীবনে একটা মস্ত ফাঁক মাঝে মাঝেই অনুভব করেছেন তাঁরা। কিন্তু সে অনুভূতি স্থায়ী হয়নি, পরক্ষণেই বিজ্ঞান এসে গ্রাস করছে তাঁদের।

সেই মুহূর্তে, সাটল রকেটে বসে প্রত্যেকের মনেই একটা কথা ভেসে এলো : যা পেয়েছি তার বাইরে চাইবার আর কিছু কি ছিল না?

প্রত্যেকের মনেই ভেসে উঠলো দু' একটি বিস্মৃত মুখ, ভীরু পায়ে কাছে আসা প্রাণী, মৌন অভিমানে যারা চলে গেছে, সরে গেছে জীবন থেকে। চিরকালের মতো।

পৃথিবী বদলায়, বদলায় গ্রহ, তারা, নক্ষত্রপুঞ্জ, শতাব্দীর পর শতাব্দী আসে, কিন্তু বদলায় না হৃদয়ের সূক্ষ্মতম অনুভূতিগুলি, বদলায় না প্রেম। সূর্যের মতোই চিরদীপ্ত আর শাশ্বত সে।

গোপনে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন সবাই। কিছুক্ষণ পরে স্বপ্নহীন গভীর নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন।

জেগে রইল বিলাসিতা ও নিকোলাই। আর জেগে রইল ব্যোমব্রহ্ম বসু। যদিও নিখুঁত যান্ত্রিক কুশলতার সঙ্গে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে নির্ভুলভাবেই ছুটছিল সাটল রকেটটা, তবু কখন কি হয় ভেবে ঠায় জেগে রইল ব্যোমব্রহ্ম।

অবসর সময়ে ইতিহাস পড়ে প্রচুর আনন্দ পায় সে। এখন হাতে কোনো কাজ নেই, তাই উঠে কেবিনের দেপয়ালের কাছে থাকা র‍্যাক থেকে 'পৃথিবীর ইতিহাস, বিংশ—পঞ্চবিংশ শতাব্দী' নামে ইয়া মোটা বইখানা তুলে নিল ব্যোমব্রহ্ম। নিজের আসনে ফিরে এসে একবার নিদ্রামগ্ন অভিযাত্রীদের দিকে তাকালো, এরপর অদূরে বসা প্রণয়ী যুগলের দিকে তাকালো। পরস্পরের হাত ধরে ফিসফাস শব্দে অনর্গল কথা ব'লে যাচ্ছিল ওরা। একটুখানি হেসে আরাম ক'রে হেলান দিয়ে বসে পড়বার আলোর সুইচ টিপে আলো জ্বালল সে। টর্চের আলোর মতো একটি রশ্মিরেখা ইতিহাসের বই-এর মলাটের ওপরে পড়ল। লেখকের নাম দেখল ব্যোমব্রহ্ম'—ডক্টর মহম্মদ আল্ আহ্সান।

বই খুলে কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মধ্যে মগ্ন হয়ে গেল ব্যোমব্রহ্ম। ইতিহাসখানা আসলে মানুষের মহাকাশ জয়েরই ইতিহাস। ছয় শতাব্দী আগে পৃথিবীতে অনেকগুলি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল। তাদের মধ্যে যতো না ছিল মিত্রতা তার চেয়ে বেশী ছিল গোপন শত্রুতা। এমন কি বিজ্ঞানীরাও সমগ্র মানব জাতির

কল্যাণে কাজ না করে নিজের নিজের রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র স্বার্থের কাছে নিজেদের বিকিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে কোনো দেশের মানুষ থাকতো প্রাচুর্যের মধ্যে মহা আরামে, ভোগ করত বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক সুবিধাগুলি, আবার কোনো দেশের মানুষের দিন কাটতো দুঃখ, কষ্ট, দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে। পৃথিবীর সব মানুষ এক হয়নি, হতে পারেনি সঙ্কীর্ণতাবাদী কিছু প্রভাবশালী লোকের জন্য। হঠাৎ সেই সময়ে একটা অঘটন ঘটে গেল। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুলাই তারিখে একটি রাষ্ট্রের উদ্যোগ মহাকাশ যানে চেপে চাঁদের বুকে পা রাখল পৃথিবীর মানুষ। সেই থেকেই যেন মহাকাশ বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। কিছুদিন পরেই মঙ্গল ও শুক্রগ্রহে তথ্যানুসন্ধানী আকাশ-যান পাঠালো দুটি ক্ষমতাশালী রাষ্ট্র। একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ঐ দুটি রাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে চাঁদে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করল, কারণ পৃথিবীতে জনসংখ্যা তখন ভয়াবহভাবে বেড়ে গিয়েছিল, সারা পৃথিবীতে দেখা দিয়েছিল চরম খাদ্যাভাব। চাঁদে উপনিবেশ স্থাপনের ব্যাপারে পৃথিবীর সব বিজ্ঞানীরাই এক হয়েছিলেন, অভূতপূর্ব প্রযুক্তি বিদ্যার কৌশল দেখালেন তাঁরা। পৃথিবী—চাঁদ, চাঁদ—পৃথিবী সাটল রকেট সার্ভিস শুরু হ'ল। এই সময়ে আবহাওয়ার ওপরও অনেকটা কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পেরেছিলেন পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা। সমুদ্রের জলের প্লঙ্ক্‌টন থেকে সুসম প্রোটিন খাদ্য তৈরী ক'রে ব্যাপক খাদ্যাভাবের কিঞ্চিৎ সুরাহা করেছিলেন। চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা একযোগে কাজ করে 'ক্যান্সার' নামে একটি মারাত্মক ব্যাধিকে নির্মূল করতে সক্ষম হন। এই সময়েই পৃথিবীর মানুষেরা সার্বজনীন ঐক্যের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হতে থাকেন, একটিমাত্র 'পৃথিবী সরকারের' দাবি জোরদার হ'তে থাকে, শেষ পর্যন্ত সারা পৃথিবীর মানুষ দু'টি মাত্র শক্তিশালী রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে গেল। এইভাবেই শেষে হ'ল দ্বাবিংশ শতাব্দী।

ত্রয়োবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই পৃথিবীর মানুষ জানতে পারল যে সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহেও বুদ্ধিমান প্রাণী আছে, যদিও তাদের আকার, আকৃতি ও প্রকৃতি আলাদা। এই আবিষ্কার পৃথিবীর মানুষের

পক্ষে এক যুগান্তকারী ঘটনা। কিন্তু তখনও বিভিন্ন গ্রহে বিপুল সংখ্যক মানুষ পাঠাবার মতো মহাকাশ-যান তৈরী করতে শেখেনি পৃথিবীর মানুষ। এই সময়েই পৃথিবীর শক্তিশালী রাষ্ট্র দুটি পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে। দুই পক্ষেরই বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়, বিশেষ ক'রে বিজ্ঞানীরাই এই যুদ্ধের লক্ষ্যবস্তু ছিলেন ব'লে দু'পক্ষেই হাজার হাজার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী মারা যান। এই যুদ্ধ মানব সভ্যতার অগ্রগতিকে প্রায় এক শতাব্দী পিছিয়ে দেয় বটে, কিন্তু রাষ্ট্র দুটি একটি কনফেডারেশনে আবদ্ধ হয়।

চতুর্বিংশ শতাব্দীতে বিশাল বিশাল রকেটে চেপে এক দল মানুষ হাজির হল গাছ-মানুষদের দেশ মঙ্গলগ্রহে। ওরা ছিল যুদ্ধবাজ, ওদের সঙ্গে ছিল মারাত্মক ধরনের আণবিক অস্ত্রশস্ত্র। মঙ্গলের গাছ-মানুষরা শান্তিপ্রিয়, কিন্তু যুদ্ধেও কম যায় না, যখন তারা দেখল যে পৃথিবী থেকে আসা আগন্তুকরা ওদের ওপর হামলা করতে উদ্যত হয়েছে, তখন তারাও মানুষদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মঙ্গলের মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে। শুরু হ'য়ে গেল শতাব্দীর চিরস্মরণীয় আন্তর্গ্রহ যুদ্ধ। সেই যুদ্ধের সময়ে নিছক আত্মরক্ষার তাগিদেই পৃথিবী সরকার গঠিত হ'ল। মঙ্গল গ্রহেরও বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রাষ্ট্র ছিল, তারাও এক হ'য়ে পৃথিবী লক্ষ্য করে যুদ্ধ রকেট পাঠাতে লাগল। একমাত্র উভয় গ্রহের বিজ্ঞানী ও দার্শনিকেরা এই যুদ্ধের বিপক্ষে জোর প্রচার শুরু করেছিলেন। শেষটায় উভয় গ্রহের বহু ক্ষয়ক্ষতি হবার পর ঐ সব বিজ্ঞানীদের ও দার্শনিকদের চেষ্টায় আবার শান্তি ফিরে এলো। এই ব্যাপারে বৃহস্পতির শান্তিবাদী প্রাণীরাও উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেছিল। সন্ধি হ'ল পৃথিবী ও মঙ্গলের মধ্যে। চতুর্বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে মঙ্গল গ্রহের হাজার ক্রোশী খালের ধারে গিমিক মহানগরে উদ্বোধন হ'ল প্রথম আন্তর্গ্রহ মহাসম্মেলনের। সেই মহাসম্মেলনে বুধ, শুক্র, মঙ্গল, পৃথিবী বৃহস্পতি আর শনির বলয়ের প্রাণীরা প্রতিনিধি পাঠালো। বহু বছর ধরে চলল সেই মহাসম্মেলন। সেই মহাসম্মেলনে সিদ্ধান্ত হ'ল যে যুদ্ধ নয়, শান্তি ও পারস্পরিক সহযোগিতাই প্রগতির

পথ। এর কিছুদিন পরেই জন্ম হ'ল সৌরজগতের বুদ্ধিমান প্রাণী অধ্যুষিত গ্রহগুলিকে নিয়ে এক বিশাল আন্তর্গ্রহ সরকারের। এই সরকারের কার্য পরিচালনা করেন এক মহাসংসদ। প্রতিটি গ্রহই প্রাণী সংখ্যার অনুপাতে নির্বাচিত প্রতিনিধি পাঠায় মহাসংসদে। এই মহাসংসদই আবার গঠন করে গ্রহমণ্ডল সরকারের মন্ত্রীমণ্ডলী। মন্ত্রীমণ্ডলীর শীর্ষে থাকেন সর্বাধ্যক্ষ। আভ্যন্তরীণ শাসনের ব্যাপারে অবশ্য প্রত্যেক গ্রহই স্বয়ং শাসিত কিন্তু বিজ্ঞান গবেষণা, বহিঃশত্রুর আক্রমণ রোধ, শিক্ষা, মহাকাশ যাত্রা, মুদ্রা ব্যবস্থা, শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যাপারে গ্রহমণ্ডল সরকারই সর্বেসর্বা। গ্রন্থকার সর্বশেষে মন্তব্য করেছেন যে গ্রহমণ্ডল সরকার গঠিত হবার পর মাত্র দেড় শতাব্দীর মধ্যে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিক্ষা-দীক্ষায়, শিল্পে-বাণিজ্যে, কারু-শিল্পে ও সাহিত্যে অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে সৌরজগতের অধিবাসীরা। সুদৃঢ় ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ তারা।

স্পেস-স্টেশন এফ্-৭২০ অন্যান্য স্পেস-স্টেশন থেকে অনেক বড়। শুক্র, বুধ, মঙ্গল আর পৃথিবীর সঙ্গে সাটল রকেট সার্ভিস চালু আছে তার। স্পেস-স্টেশনটি এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যাতে সেটা স্ব-নির্ভর হয়ে থাকতে পারে। গভীর মহাকাশে পাড়ি দেবার সময়ে এই স্পেস-স্টেশনকেই ব্যবহার করা হয়।

ব্যোমব্রহ্মের সাটল রকেটটি তাঁর গায়ে এসে যখন ভিড়ল তখন উজ্জ্বল আলোয় চারদিক ভরে গেছে। মহাশূন্যের নিকষ কালো অন্ধকারে কটা দিন কাটাবার পর সূর্যের আলো খুবই মনোরম লাগল অভিযাত্রীদের কাছে। বৃহস্পতি আর শনির বলয় থেকে যারা এসেছেন তাঁরা থাকেন সূর্য থেকে অনেক দূরে, দীপ্ত সূর্যের অপর্যাপ্ত আলো থেকে চিরবঞ্চিত তাঁরা! জমাট বাঁধা মিথেন আর এ্যামো-নিয়ার দেশ তাঁদের। তাই চু-গা আর জা-রোর আনন্দ আর ধরছিল না।

অবতরণ ক্ষেত্রে একটি রবট অপেক্ষা করছিল, সে-ই সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল বোম্বালভিয়ার অফিসে। বিলাসিতা আর নিকোলাই ওদের সঙ্গে গেল না, তারা গেল স্পেস-হোটেল 'বিস্বার্কে'। স্পেস-স্টেশনে পৌঁছুবার একটু আগেই উভয় পক্ষের সম্মতিতে পরস্পরকে বিয়ে করেছে ওরা। সাক্ষী ছিল ব্যোমব্রহ্ম আর বিজ্ঞানী অভিযাত্রীরা। এখন এই স্পেস-স্টেশনের নিরিবিলিতে মধুচন্দ্রিমা যাপন করবে ওরা।

স্পেস-স্টেশন এফ ৭২০-র অতিথি কক্ষটি বেশ সুন্দরভাবে সাজানো। স্পেস-কম্যাণ্ডার ব্যোমব্রহ্ম আর বিভিন্ন গ্রহ থেকে আসা অভিযাত্রীরা আরাম-আসনে বসে বিশ্রাম করছিল, মৃদু কণ্ঠে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিল। অভিযানের প্রথম ধাপটি বেশ নির্বিঘ্নেই কেটে গেল বলে খুব খুশী ওরা।

ঘরের দেওয়ালে চুম্বক শক্তিতে আটকে থাকা মঙ্গলগ্রহের বিখ্যাত পাহাড় লুম্‌ডা-র কিউবিষ্ট রীতিতে আঁকা সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডারটির দিকে তাকিয়েছিল ব্যোমব্রহ্ম। ঐ পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে গিয়ে একবার যে বিপদে পড়েছিল তার কথা মনে পড়ছিল তার। কিছুক্ষণ পরে মন থেকে ওসব আজেবাজে চিন্তা নির্বাসিত করে ঘরের চারদিকে তাকালো সে। স্পেস-স্টেশন এফ-৭২০-র এই মনোরম অতিথি কক্ষটিতে এর আগেও বহুবার এসেছে ব্যোমব্রহ্ম। ঘরের বাইরে মৃত্যু-তুহিন আবহাওয়া, কিন্তু ঘরের ভেতরটা বেশ কবোষ্ণ। শুক্রগ্রহের এক ধরনের ঘাস থেকে বিপাকীয় পদ্ধতিতে তৈরী অতিশয় সূক্ষ্ম তন্তু জমিয়ে অতিথি কক্ষের মেঝে, দেওয়াল, ছাত আর দরজা তৈরী করা হয়েছে। খুব নরম। ভারহীন অবস্থাতেও বেশ আরামে থাকা যায়। চেয়ার, টেবিল, সোফা ও অন্যান্য আসবাবপত্রও তৈরী করা করা হয়েছে শনির বলয়ের জঙ্গলে জাত ভেনট্রিকুলাস ভিকিওলাস গাছের রস জমিয়ে। এর একটা বিশেষ সুবিধা এই যে দরকার হলে আসবাব-পত্রগুলোকে জেরমানিয়াম ক্লোরাইড্ সলিউশনে দ্রবীভূত করা যায়।

সেই তরল, দ্রবীভূত পদার্থটিকে কোনো একটা পাত্রে ভরে ইচ্ছে মতো যেখানে খুশী সেখানে নিয়ে যাওয়া যায়। পরে আবার বিশেষ প্রক্রিয়ায় ইচ্ছা মতো নক্‌শায় আসবাবের আকার দিলেই হ'ল। ব্যোমব্রহ্মের কাঞ্চনজঙ্ঘার ফ্ল্যাটে ঠিক এই ধরনের কোনো আসবাবপত্র নেই। আন্তর্গ্রহ বাজারে এর বেশ দাম। তবু এই মার্কোসাপলাস অভিযান থেকে ফিরে এসে কয়েকটি ভেনট্রিকুলাস আসবাব কিনবে ব'লে মনে মনে ঠিক করে ফেলল ব্যোমব্রহ্ম।

কানে লাগানো অডিওস্কোপে হঠাৎ একটা শব্দ হতেই চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে গেল ব্যোমব্রহ্মর। চমকে তাকিয়ে দেখল যে নিজের অফিস থেকে অতিথি কক্ষের দিকে উড়ে আসছে স্পেস-স্টেশনের অধ্যক্ষা বুধ-কুমারী বোম্বালভিয়া। তার স্পেস-স্যুটের পিঠে আটকানো অটো-ফ্লাইং মেশিন তাকে মেঝে থেকে মাত্র এক মিটার ওপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে আসছে ঠিক একটা পাখির মতো। ব্যোমব্রহ্মের সামনে এসে বুকের কাছে আটকে থাকা বোতামে আঙ্গুল ছোঁয়ালো বোম্বালভিয়া, সঙ্গে সঙ্গে অটো ইলেকট্রিক সার্কিটের ছোঁয়ায় জুতোর নীচে আটকে থাকা ইলেকট্রো-ম্যাগনেট জীবন্ত হয়ে উঠল, বোম্বালভিয়ার পা মেঝের ওপর আটকে গেল। ব্যোমব্রহ্মের সামনে সোজা হয়ে দাঁড়ালো সে, তার চোখে চোখ রেখে একটু হাসল।

বোম্বালভিয়ার সঙ্গে এই তার নতুন পরিচয় নয়, তবু এবার যেন নতুন চোখে দেখল তাকে ব্যোমব্রহ্ম। মহাকাশের স্পেস-স্টেশন-গুলির মধ্যে সবচেয়ে কর্মব্যস্ত স্পেস-স্টেশনের অধ্যক্ষা হয়েছে বোম্বালভিয়া। তার আগে গিমিক মহাবিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ্যসট্রো-ফিজিক্স-এ ডক্টরেট হয়ে প্রথম কয়েক বছর ছোট ছোট স্পেস-স্টেশনে কাজ করেছে সে। খুব খানদানী ঘরের মেয়ে। তার বাবা আন্তর্গ্রহ মহাসংসদের মাননীয় সদস্য।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল স্পেস-কম্যাণ্ডার ব্যোমব্রহ্ম, আন্তর্গ্রহ ভাষায় বলল,—'ছি ছি, তুমি আবার কষ্ট করে এখানে এলে কেন বোম্বালভিয়া? রবট পাঠিয়ে খবর দিলেই তো হাজির হতাম তোমার অফিসে।'

বোম্বালভিয়ার কণ্ঠস্বর ঠিক পৃথিবীর মানুষের মতো নয়, অনেকটা ঝরণা ধারার মতো। সেই স্বরে ব'লে উঠলো সে,—'না না কষ্ট আবার কি? এলাম তোমাকে স্বাগত জানাতে। মার্কোসাপলাসের অভিযাত্রী দলটিকে অবশ্য আগেই দেখেছিলাম টেলিভিসোস্কোপে, তবু চাক্ষুষ দেখবার কৌতূহলটা চেপে রাখতে পারলাম না।'

'তা বেশ করেছ, এসো পরিচয় করিয়ে দিই—' ব'লে একে একে ছয়-জন বিজ্ঞানী-অভিযাত্রীর সঙ্গে বোম্বালভিয়ার পরিচয় করিয়ে দিল ব্যোমব্রহ্ম। সবাইকে সাদর সম্ভাষণ জানালো সে, তারপর ব্যোম-ব্রহ্মের পাশের সোফাটিতে ঝুপ করে বসে পড়ল, বলল,—'পৃথিবী এখান থেকে বহু দূরের পথ সেই পথ অতিক্রান্ত করে এসেছেন আপনারা, নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত। আমার এখানে আছে ক্লান্তিহর মহার্ঘ পানীয় ট্রুয়াম, তার কয়েক চুমুক খেলেই চাঙ্গা হয়ে উঠবেন আপনারা।'

ট্রুয়ামের নাম শোনামাত্র সবার চোখ চকচক ক'রে উঠল। অডিওস্কোপে ট্রুয়াম আনবার নির্দেশ দিল বোম্বালভিয়া।

একটু পরেই একটি রবট ঢুকলো অতিথি কক্ষে, তার হাতে একটা বড় ট্রে। ট্রের মাঝখানে বসানো একটা লাল রং-এর জাগ, তার চারপাশে অনেকগুলো ছোট ছোট গ্লাস। একটা ভেনট্রিকুলাস টেবিলের ওপর ট্রে-টা নামিয়ে রাখল রবটটি।

জাগের ভিতর থেকে টকটকে লাল ট্রুয়াম গন্ধ ছড়াচ্ছিল, অভিযাত্রীরা সেই গন্ধ টেনে নিয়ে বুক ভরাচ্ছিল। গোটা স্পেস-স্টেশনটি বায়ুশূন্য হলেও হোটেলগুলি, বাড়ি আর অফিসগুলিতে কৃত্রিম উপায়ে বায়ু সঞ্চালনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছিল।

ব'সে ব'সেই বোম্বালভিয়া তার টেলিস্কোপিক হাত তিন হাত লম্বা ক'রে টেবিলের ওপর থেকে ট্রুয়ামের জাগটা তুলে নিল। গ্লাসে গ্লাসে অল্প ক'রে ট্রুয়াম ঢালল, তারপর গ্লাসগুলো একে একে বিজ্ঞানী অভিযাত্রীদের হাতে তুলে দিল। ব্যোমব্রহ্মও বাদ পড়ল না।

ট্রুয়াম খেতে খেতে অভিযাত্রীদের সঙ্গে আলাপ করছিল বোম্বালভিয়া,

হঠাৎ এক সময়ে মুখ ফিরিয়ে ব্যোমব্রহ্মের মুখে তাকালো, বলল,—'আমার চিঠিটা পেয়েছিলে ব্যোমব্রহ্ম?'

'হ্যাঁ। অভিযানে বেরিয়ে পড়বার একটু আগেই পেয়েছিলাম। পেয়ে সত্যিই খুব খুশী হয়েছি বোম্বালভিয়া।'

'ঐ চিঠিতে আমি কয়েকটা প্রশ্ন তুলেছিলাম ব্যোমব্রহ্ম।'

'জানি। কিন্তু অভিযানের ঝামেলায় ওসব নিয়ে আর ভাববার সময় পেলাম কোথায়?'

টিম্বালটিয়া আর জোম্বালজিয়া উৎসুক চোখে তাকিয়ে ওদের কথা শুনছিল। হাজার হোক মেয়ে তো! কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে হঠাৎ ব'লে উঠলো টিম্বালটিয়া,—'গোপনীয় কিছু না হ'লে আপনার প্রশ্ন সম্পর্কে কিছু জানতে পারি কি বোম্বালভিয়া?'

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বোম্বালভিয়া বলল,—'বিষয়টা আমাদের ব্যক্তিগত হ'লেও প্রশ্নটা কিন্তু সার্বজনীন। আন্তগ্রহ বিয়ে সম্পর্কে স্পেস-কম্যাণ্ডারের মতামত জানতে চেয়েছিলাম।'

কথাটা শুনে সবাই একটু নড়ে চড়ে বসল, রোমান্সের গন্ধ পেল যেন। ব্যোমব্রহ্ম বলল, ইদানীং আন্তর্গ্রহ বিয়ে কিছু কিছু হচ্ছে বটে, কিন্তু ভবিষ্যৎ প্রজাতির পক্ষে সেটা শুভকর হবে কিনা তা কেউ বলতে পারছে না।'

বি-মা বলে উঠলো,—'তা ছাড়া সৌরজগতের জনমত এখনো এ ধরনের বিয়ের অনুকূল নয়।'

বোম্বালভিয়া বলল,—'ইতিহাস কিন্তু বলে যে জনমত চিরকালই রক্ষণশীল, তারা চিরদিনই প্রগতির বিরুদ্ধে রায় দিয়ে থাকে, কিন্তু প্রগতিপন্থী যুব শক্তি তার পরোয়া না করেই এগিয়ে যায় আর শেষ পর্যন্ত জয়ীও হয়। এই বিয়ের ফলে নতুন সৌরজাতির উদ্ভব হবে।'

খুব আগ্রহের সঙ্গে বিতর্কটা শুনছিল জোম্বালভিয়া, এবার সেও তর্কে যোগ দিল,—'ঠিক বলেছেন বোম্বালভিয়া। বুধ গ্রহের প্রগতিবাদী "মহাকাশ"ও খুব জোরালো ভাষায় আন্তর্গ্রহ বিয়ের পক্ষ সমর্থন করেছে।'

সং-লাও চুপ ক'রে রইলো না,—'কিন্তু শুক্রগ্রহের বেশীর ভাগ পত্রিকাই এই ধরনের বিয়ের বিপক্ষে রায় দিয়েছে জোম্বালজিয়া।'

বৃহস্পতির জীব-বিজ্ঞানী চু-গা এগিয়ে এলো জোম্বালজিয়ার সাহায্যে, বলল,—'মনে রাখবেন যে গ্রহমণ্ডলের যুবক-যুবতীরা ওসব রক্ষণশীল মতবাদ মেনে নেবে না। বিয়ের ব্যাপারে গ্রহের ব্যবধান তারা ভাঙ্গবেই ভাঙ্গবে। এরই মধ্যে ওদের মধ্যে বিদ্রোহের ভাব দেখা দিয়েছে। সৌরজগতে আন্তগ্রহ প্রেম খুবই চালু এখন। বাইশ লক্ষ তিরাশী হাজার সাতশ' দশটি আন্তর্গ্রহ বিয়ে এরই মধ্যে হয়ে গেছে। জীব-বিজ্ঞান এখন এমন একটা অবস্থায় এসেছে যে ডি.এন.এ. ঘটিত সমস্যা তাদের কাছে কোনো সমস্যাই নয়।'

যুব শক্তির বিদ্রোহের কথাটা ব্যোমব্রহ্ম জানতো না। সে তো হরদমই মহাকাশে পাড়ি দিচ্ছে জানবেই বা কী করে, তাই বলল,—'আপনি বুঝি এ্যাংরি জেনারেশনের কথা বলছেন ডক্টর চু-গা ?'

না স্পেস-কম্যাণ্ডার। তারা মুষ্টিমেয়, তারা চায় সব রকমের সমাজ ব্যবস্থা লণ্ডভণ্ড ক'রে দিতে, তারা অবাধ প্রেমের পূজারী, বিয়ের বন্ধনে বাঁধা পড়তে চায় না। তাদের কথা আমি বলছি না। আমি বলছি সত্যিকারের শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের কথা। তারা খাঁটি জীব-বিজ্ঞানের দিক থেকে বিচার করছে আন্তর্গ্রহ বিয়ের ব্যাপারটাকে। আরও ভালো প্রজাতির উদ্ভবই তাদের কাম্য, তারা হবে পৃথিবীর মানুষের মতো রূপবান, বৃহস্পতির প্রাণীর মতো সংস্কৃতিবান, মঙ্গলের গাছ-মানুষের মতো বুদ্ধিমান, শনির বলয়ের প্রাণীর মতো বলবান আর বুধ বা শুক্রের প্রাণীর মতো চটপটে

মহা উৎসাহে ব'লে উঠলো জোম্বালজিয়া,—'ডক্টর চু-গার কথায় সমর্থন করছি আমি।'

চু-গার মুখ চকচক করছিল, বলল,—'আমি সম্প্রতি একটি গবেষণামূলক বই লিখেছি। নাম ঃ "আন্তর্গ্রহ বিবাহের বৈজ্ঞানিক দিক।" তারই একটি অধ্যায় "সৌরজগতের নতুন জাতি" পড়তে অনুরোধ করছি সবাইকে।'

জা-ব্লো এতক্ষণ একটি কথাও বলেনি। বহুদূরের গ্রহের প্রাণী সে, তাই তর্ক-বিতর্কে যোগ দিতে একটা স্বাভাবিক অনীহা আছে তার। এবারে সে-ও বলল,—'অন্য সব কিছু ছেড়ে দিলেও একটি ব্যাপারে যে সুরাহা হবে সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।'

ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বি-মা বলল,—'কি ব্যাপার সেটা ?'

'গ্রাহকতা। প্রাচীনকালের আঞ্চলিকতার মতো এটাও একটা ব্যাধি বিশেষ। নিজের গ্রহের সবই শ্রেষ্ঠ, অন্য গ্রহের সবই খারাপ এমন একটা ধারণা অনেকের মনেই বর্তমানে আছে। নতুন প্রজাতির মনে সে রকম ধারণা জন্মাবার কোনো সম্ভাবনাই থাকবে না।'

বোম্বালভিয়ার মুখখানা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো, বলল,—'আসুন সমাজ সংস্কারের এই উদ্যমে আমরা সবাই হাত মেলাই। আর এই সফল বিতর্কের আনন্দে সবাই মিলে আর এক প্রস্থ ট্রুয়াম খাই।'

সমস্বরে বোম্বালভিয়ার প্রস্তাবে সায় দিল সবাই। শুধু ব্যোমব্রহ্মাই মুচকি মুচকি হাসছিল। সে আড়চোখে লক্ষ্য করেছিল যে এরই মধ্যে বৃহস্পতির দু' নম্বর চাঁদ থেকে আসা চু-গা আর বুধের মেয়ে জোম্বালজিয়া পরস্পরের দিকে অন্য ধরনের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে।

পরদিন সকালে মঙ্গলগ্রহ থেকে আনা ঝো-প-জন্তু বিম্ব্রিং-এর মাংসের কাটলেট সহযোগে ব্রেকফাস্ট সেরে অভিযাত্রীরা কয়েকটি দলে ভাগ হ'য়ে স্পেস-স্টেশনটা ঘুরে দেখতে গেল। ব্যোমব্রহ্মা থেকে গেল অভিযান সংক্রান্ত ব্যাপারে বোম্বালভিয়ার সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য।

শুক্র আর মঙ্গল থেকে আসা দুইটি সাটল রকেটের বিলি-ব্যবস্থা শেষ করে অডিওস্কোপে ব্যোমব্রহ্মাকে অফিসে ডেকে পাঠালো বোম্বালভিয়া।

বোম্বালভিয়ার অফিস ঘরটি গোলাকার। ছাত অবতল। বৃহস্পতি থেকে আনা উজ্জ্বল পাথরে মোজাইক করা মসৃণ মেঝেতে ব্যোমব্রহ্মের চুম্বক-জুতো আটকে ছিল। একদিকের স্বচ্ছ নীলাভ দেওয়ালে গ্যালাক্সীর বিভিন্ন তারকা জোটের আলাদা আলদা বিশাল ফটো-

গ্রাফ আটকে ছিল, অন্য দিকের দেওয়ালে ছিল সৌরজগতের বহুগুণ পরিবর্ধিত ফটো। বোম্বালভিয়ার ডেস্কের পেছনেই দেওয়ালে আটকে ছিল গ্রহমণ্ডল সরকারের প্রধান মন্ত্রীর একটি আবক্ষ ফটোগ্রাফ। স্পেস-স্টেশনের সুবিধা এই যে ফটো টাঙাতে কোনো পেরেকের প্রয়োজন হয় না, হাতে তুলে জায়গামত রেখে দিলেই হ'ল।

মস্ত অফিস ঘরের ধার ঘেঁষে বোম্বালভিয়ার ভেনট্রিকুলাম টেবিল। বেশ বড় টেবিল, নানান ধরনের ফাইল আর বিভিন্ন গ্রহ থেকে আসা চিঠিপত্রে আকীর্ণ। টেবিলের তিন দিকে অভ্যাগতদের বসবার আসন, তাদের পায়াতেও চুম্বক লাগানো। টেবিলের ডান দিকে একটা বড় ফাইলিং কেবিনেট তার পাশে মাইক্রো-ফটোফিল্ম রাখবার আলমারি, অফিস ঘরেই যাতে তাদের প্রোজকেশন করা যায় তারও ব্যবস্থা আছে। টেবিলের ওপরে দুটি অডিওভিসোস্কোপ, —একটি আভ্যন্তরীণ, অন্যটি বিভিন্ন গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্য বহির্মুখী। পাশেই একটি টেলিভিসোস্কোপ। এতে কথা বলবার সময়ে যার সঙ্গে কথা বলছে তার ছবি পরদার গায়ে ফুটে ওঠে।

চুম্বক জুতো পায়ে ব্যোমব্রহ্ম যখন বোম্বালভিয়ার অফিসে ঢুকলো তখন অডিওভিসোস্কোপে কাকে যেন কয়েকটা জরুরী নির্দেশ দিচ্ছিল বোম্বালভিয়া।

হয়তো কোনো উত্তেজনার কারণ ঘটেছিল, ব্যোমব্রহ্ম দেখল যে বোম্বালভিয়ার মাথা থেকে বেরিয়ে আসা এ্যান্টেনা তির-তির ক'রে কাঁপছে, তার নীল চোখে বেগুনী আভা ঝিলিক দিচ্ছে। ইঙ্গিতে ব্যোমব্রহ্মকে বসতে বলল বোম্বালভিয়া। বুধগ্রহের আঞ্চলিক ভাষায় কথা হচ্ছিল ব'লে এক বিন্দুও বুঝতে পারছিল না ব্যোমব্রহ্ম, তবে বোম্বালভিয়ার টেলিস্কোপিক হাত পায়ের ক্রমাগত কমা বাড়া দেখে একটু বুঝল যে বেশ গুরুতর কোনো ঘটনা ঘটেছে।

কথা শেষ ক'রে অডিওভিসোস্কোপ বন্ধ ক'রে দিল বোম্বালভিয়া। তার গম্ভীর মুখখানা থমথম করছিল, আন্তর্গ্রহ ভাষায় বলল,—'মহাকাশে আবার একটা ডাকাতি হয়েছে স্পেস-কম্যাণ্ডার।'

এ ধরনের খবরের জন্য প্রস্তুত ছিল না ব্যোমব্রহ্ম, সবিস্ময়ে ব'লে উঠলো,—'সেকি ? কোথায় ?'

'প্লুটো থেকে রেডিয়াম নিয়ে আসছিল কারগো রকেট ঝিলিং, ইউরেনাসের কক্ষপথ ছাড়াবামাত্র তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মহাকাশ দস্যুরা, পাইলট ও অন্যান্য রবটদের নিষ্ক্রিয় ক'রে দশ টন মহামূল্যবান রেডিয়াম লুট করে নিয়ে গেছে ওরা। আন্তর্গ্রহ চোরা-বাজারে অনেক দাম হবে তার।'

ব্যোমব্রহ্মর মুখ কঠিন হয়ে উঠল, বলল,—'আস্পর্ধা তো কম নয়। এ নিশ্চয়ই জোরেক্সের দলের কাজ। সেবার আচ্ছা শিক্ষা দিয়েছিলাম ওদের, আবার ওদের বাড় বেড়েছে দেখছি। ঠিক আছে, এই মার্কো-সাপলাস অভিযান থেকে ফিরে এসে দেখে নেব কত বড় ডাকাত হয়েছে ওরা। ইউরেনাসের প্রাণীহীন একটা চাঁদেই গোপন আড্ডা ওদের, সুপার ডিভাসটেটিং রশ্মি দিয়ে সেই আড্ডাটাকেই ধ্বংস ক'রে দেব এবার। ইতিমধ্যে মহাকাশ রক্ষীবাহিনী তাদের কাজ করতে থাক।'

কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে রইলো ওরা দু'জন, তার পরে ম্লান হাসি হেসে বোম্বালভিয়া বলল,—'ফিরে এসে জোরেক্সের মোকাবিলা করবে তুমি ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু এ প্রশ্ন কেন বোম্বালভিয়া ?'

সরাসরি এ কথার জবাব না দিয়ে বোম্বালভিয়া বলল,—তুমি খুব আশাবাদী, তাই না ব্যোমব্রহ্ম ?'

'নিশ্চয়ই, বেঁচে থাকতে, জীবনে উন্নতি করতে প্রেরণা জোগায় কে ? আশা-ই তো।'

'একটা অজানা তারায় অতি বুদ্ধিমান প্রাণীর সন্ধানে যাচ্ছো তোমরা, তবু ফিরে আসবার আশা রাখো ?'

'নিশ্চয়ই—' খুব জোর দিয়ে বলল ব্যোমব্রহ্ম, 'নিশ্চয়ই ফিরে আসব আমরা।'

'কিন্তু এ যে কী প্রচণ্ড ঝুঁকি—'

'ঝুঁকি আছে বলেই তো তার আকর্ষণ আরও তীব্র বোম্বালভিয়া।'

'তা ঠিক। কিন্তু ওরা যদি তোমাদের বন্দী ক'রে রাখে? আর ফিরতে না দেয়?'

'কেন বন্দী ক'রে রাখবে কেন?'

যে চিন্তাটা ক'দিন ধরেই বোম্বালভিয়ার মনটাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল তা এবারে সোচ্চার হ'ল। বোম্বালভিয়া বলল,—'আমাদের সৌর-জগতে জীব-জগতের বিবর্তনটা প্রায় একই ধারার হয়েছে, তাই বিভিন্ন গ্রহের অধিবাসীরা আকৃতিতে আলাদা হ'লেও প্রকৃতি ও মানসিকতায় এক। কিন্তু গ্যালাক্সীর সুদূর প্রান্তে, সৌরজগত থেকে বহু দূরে মার্কোসাপলাসে যে কী ধরনের জীব সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে কিছুই জানি না আমরা। আকৃতির কথা ছেড়েই দিলাম, প্রকৃতি ও মানসিকতায় তারা আমাদের সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়াই সম্ভব। যদি তারা তোমাদের এই বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধানী অভিযানকে সুনজরে না দেখে? যদি তোমাদের শত্রু ব'লে ভাবে তারা!'

'ভুলে যাচ্ছ কেন যে সঙ্কেত পাঠিয়ে ওরাই আমন্ত্রণ জানিয়েছে আমাদের।'

'কিন্তু সে সঙ্কেত যে সৌরজগতের প্রাণীদের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে তা-ই বা ধ'রে নিচ্ছ কেন ব্যোমব্রহ্ম? হয়তো মার্কোসাপলাসের কাছাকাছি অন্য কোনো গ্রহ বা মৃত তারায় মার্কোসাপলানদের সগোত্রীয় কোন প্রাণীদের উদ্দেশ্যেই ঐ সঙ্কেতগুলো পাঠাচ্ছে ওরা!'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ ক'রে রইলো ব্যোমব্রহ্ম, তারপর বলল,—'হ্যাঁ, তোমার বক্তব্যে জোরালো যুক্তি আছে বোম্বালভিয়া। কথাটা ভেবে দেখবার মতো। সে যাই হোক, যে কোনো অতর্কিত আক্রমণ প্রতিহত করবার মতো অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নিয়েই যাবো আমরা। তুমি তার ব্যবস্থা ক'রে দাও।'

'কোন্ কোন্ অস্ত্র চাও তুমি?'

'প্রথমেই চাই সুপার ডিস্ইন্টিগ্রেটিং রশ্মি ছুঁড়বার কামান আর রিভলবার। এই রশ্মি চোখের পলকে যে-কোনো ধাতুকে বিশুদ্ধ

এনার্জিতে পরিণত করে দিতে পারে, তার আর চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যায় না কোথাও।'

'ঠিক আছে, পাবে। এছাড়া আর কী চাও?'

'আর চাই এক লক্ষ ভোল্ট্ বিদ্যুৎ তরঙ্গ ছুঁড়বার মেশিন ও তার জেনারেটার। যার ওপর পড়বে তা-ই পুড়ে ছাই হ'য়ে-যাবে।'

'হ্যাঁ। অতি মারাত্মক অস্ত্র ওটা। পাবে। আর কি?'

'আর যে কোনো ধরনের রশ্মি প্রতিহত করবার মতো স্পেসস্যুট। মার্কোসাপলাসে যে কী ধরনের মহাজাগতিক রশ্মি বিকিরণ হয় তা আমরা জানি না। কাজেই সাবধান হওয়া ভালো।'

'আচ্ছা, তা-ও পাবে। এবারে তোমার অভিযানের জন্য আমরা কি কি ব্যবস্থা করেছি তা শোনো। গ্রহমণ্ডল সরকারের সর্বাধুনিক ফোটন ব্রিগেড্ থেকে একটা বিরাটকায় ফোটন স্পেস্-শিপ এসেছে তোমাদের মার্কোসাপলাসে নিয়ে যাবার জন্য। তার গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ পাঁচ হাজার মাইল। মার্কোসাপলাসের দূরত্বের কথা বিবেচনা করেই এই অতি দ্রুতগামী মহাকাশ-যানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'তবু যেতে আসতে চার বছরের ওপরে লেগে যাবে বোম্বালভিয়া। অবশ্য অসীম মহাশূন্যে সময়ের বোঝা চেপে বসতে পারবে না আমাদের ঘাড়ে, হুশ ক'রে কেটে যাবে চারটে বছর।'

'কিন্তু এই চারটি বছর যে পাষাণ ভার হ'য়ে আমার বুকের ওপর চেপে বসে থাকবে ব্যোমব্রহ্ম!'

বোম্বালভিয়ার কণ্ঠের আবেগ আর তার বিষণ্ণ স্বর ব্যোমব্রহ্মের মনটাকে নাড়া দিয়ে গেল। তার ভালোবাসার গভীরতা মুগ্ধ করল তাকে। সান্ত্বনা দিয়ে বলল,—'ও নিয়ে তুমি ভেবো না বোম্বালভিয়া, চিকিৎসা বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে আমাদের আয়ু এখন তিনশ' বছরেরও বেশী। যৌবনও প্রাচীনকালের মতো ক্ষণস্থায়ী নয়। এই ক'টা বছর ধৈর্য ধরে থাক তুমি! হলদে তারা থেকে অনেক মণি-মাণিক্য নিয়ে আসব তোমার জন্য, গলায় ঝুলিয়ে দেব রত্নহার!'

টেলিস্কোপিক হাত দিয়ে চার চোখের জল মুছে নিয়ে ধরা গলায় বোম্বালভিয়া বলল,—'দু'টি রবট থাকবে তোমার স্পেস-শিপে, তোমার কথামত কাজ করবে তারা। স্পেস-শিপে দশ বছর চলবার মতো আণবিক জ্বালানী থাকবে। খাবার-দাবারও প্রচুর থাকবে। একটি ইলেকট্রনিক সাইবারনটিক কমপিউটার থাকবে কনট্রোল প্যানেলে। মহাকাশ সংক্রান্ত যে কোনো জটিল সমস্যা সমাধান করবার ক্ষমতা আছে তার। এ ছাড়া আছে একটি অতি আধুনিক স্বয়ংক্রিয় ল্যাবরেটরী। অবসর সময় কাটাবার জন্য পঞ্চাশটা মাইক্রো-ফিল্ম দেওয়া হয়েছে। স্পেস-শিপের লাইব্রেরীতে পাবে বিভিন্ন গ্রহ থেকে বাছাই করা বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, শিল্প ও সাহিত্যের ওপরে লেখা দশ হাজার মাইক্রো-বই। স্পেস-শিপের খোলে আছে একটি হেলিকপ্টার ট্যাক্সি, আণবিক শক্তি চালিত ট্যাঙ্ক-ট্যাক্সি, খনিজ সম্পদ আহরণ করবার যন্ত্রপাতি আর অন্ধকারে দেখবার জন্য ইন্‌ফ্রা-রেড্‌ রশ্মি যুক্ত বিশেষ ধরনের চশমা। মঙ্গল গ্রহের মহাকাশ কনট্রোল স্টেশন তোমাদের যাত্রাপথ নিখুঁতভাবে কমপিউট ক'রে দিয়েছে। এই নাও তার নকশা।'

নক্‌শাটা মনোযোগের সঙ্গে দেখল ব্যোমব্রহ্ম। তার অভিজ্ঞ চোখও কোনো খুঁত বার করতে পারল না সেই ডায়াগ্রামে। অবশ্য যাত্রা শুরু করবার পর যাত্রাপথের অল্প-স্বল্প পরিবর্তন সব স্পেস-কম্যাণ্ডারকেই ক'রে নিতে হয়, কিন্তু সে পরের কথা।

শেষ বারের মতো নক্‌শাটা দেখে নিয়ে ব্যোমব্রহ্ম বলল,—'চমৎকার! সব ব্যবস্থা নিখুঁত দেখছি। কবে রওনা হ'তে হবে?'

'আজই। বিকেল চারটা দশ মিনিটে।'

'ঠিক আছে—' ব'লে উঠতে যাচ্ছিল ব্যোমব্রহ্ম, বোম্বালভিয়া তার টেলিস্‌কোপিক হাত বাড়িয়ে তার হাতটা চেপে ধরল, তৃষ্ণা ভরা চার চোখের দৃষ্টি তার মুখে ফেলে গম্ভীর স্বরে বলল,—'ভালোভাবে থেকো ব্যোমব্রহ্ম, সাবধানে থেকো, তোমার জন্য প্রতীক্ষার প্রহর গুনবো আমি।'

অভিভূতের মতো ব্যোমব্রহ্ম বলল,—'মহাশূন্যের নিঃসঙ্গতাটুকু তোমার স্মৃতি দিয়ে ভরে রাখবো বোম্বালভিয়া। হয়তো তোমার জন্যই সব সঙ্কট কাটিয়ে ফিরে আসব আমি।'

বোম্বালভিয়ার ঘড়ির মতো চ্যাপ্টা মুখে হাসি ফুটলে, তার নিশ্বাস তীব্রতর হ'ল, আসন ছেড়ে উঠে ব্যোমব্রহ্মের কাঁধে মাথা রাখল সে।

মহাকাশ ঘড়ি অনুসারে চল্লিশ দিন তেইশ ঘণ্টা কেটে গেছে। ব্যোমব্রহ্মার সুপরিচালনায় অতিকায় ফোটন স্পেস-শিপটি তখন ক্রুগার-৬০ নামে যুগ্ম তারা থেকে ৫৫ ডিগ্রী ৩৫ মিনিট ২৫ সেকেণ্ড কোণ ক'রে নির্ভুল লক্ষ্যে অজানা তারা মার্কোসাপলাসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল সেকেণ্ডে এক লক্ষ পাঁচ হাজার মাইল বেগে।

যাত্রাপথে ছোটোখাটো বাধা বিপদ এসেছিল বৈ কি। হঠাৎ একদিন ওদের ফোটন ইঞ্জিনে অভাবিত চেইন রিএ্যাকশন দেখা দিয়েছিল। চু-গা, সং-লা আর ব্যোমব্রহ্মের নিরলস চেষ্টায় আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পায় তারা। আর একটু দেরী হ'লেই নিঃসীম মহাশূন্যে তাদের ফোটন মহাকাশযানটি আণবিক বিস্ফোরণে টুকরো টুকরো হয়ে যেতো, পৃথিবীর কেউ হয়তো কখনো তা জানতেও পারতো না।

বিপদ থেকে মুক্ত হবার পরেই চলল তার কারণ অনুসন্ধান। এ্যাসট্রো ফিজিসিস্ট টিম্বালটিয়া অনেক গবেষণা ক'রে প্রমাণ করল যে বহু দূরবর্তী একটি নীল তারার অজ্ঞাত রশ্মির প্রভাবেই আণবিক জ্বালানীতে চেন রিএ্যাক্শন এসে গিয়েছিল। এর পরেই এক অদ্ভুত রোগে পড়ল টিম্বালটিয়া, চোখে ঝাপসা দেখতে লাগল সে। স্পেস-শিপের সিক রুমে পার্থিব ত্ব'মাস থেকে এ্যাসট্রো ফিজিশিয়ান জোম্বালজিয়ার সু-চিকিৎসায় শেষ পর্যন্ত সেরে উঠলো সে। এই রোগের কারণও নাকি সেই বহু দূরবর্তী নীল তারার তেজস্ক্রিয় রশ্মিবিকিরণ।

তৃতীয় বিপদ এলো সৌরজগতের সীমা অতিক্রম করবার পর। সূর্যের চেয়ে তিন গুণ বড় এক মহাসূর্যের আকর্ষণ বলয়ের ভেতরে পড়ে গিয়েছিল মহাকাশযানটা। তার প্রচণ্ড আকর্ষণে দিকভ্রান্ত তরণীর

হাল হ'ল তাদের। এই আকর্ষণের বাইরে যেতে না পারলে মহাকাশ-যানটিকে চিরকালের জন্য ঐ মহাসূর্যের অতিক্ষুদ্র গ্রহ বা উপগ্রহ হ'য়ে তার চার পাশে ঘুরতে হ'ত—হয়তো বা অনন্তকালের জন্য। দক্ষ নাবিকের মতো এমার্জেন্সী কনট্রোল গীয়ার খুলে দিল ব্যোমব্রহ্ম, সাত দিনের আণবিক জ্বালানী এক দিনেই নিঃশেষ হয়ে গেল বটে, কিন্তু কাজ হ'ল তাতে, মহাকাশে গতিবেগ একলাফে সেকেণ্ডে এক লক্ষ আশী হাজার মাইল হয়ে গেল, মহাসূর্যের আকর্ষণ ছিন্ন করার জন্য যে ঐ গতিবেগই যথেষ্ট তা সে আগে থেকে জেনে নিয়েছিল কমপিউটারের কাছ থেকে। মহাসূর্যের আকর্ষণ বলয় থেকে বেরিয়ে এসে কয়েকদিন পথ হারার মতো ঘুরে বেড়াল মহাকাশযানটি তারপর নক্সা দেখে তাকে ঠিক রাস্তায় নিয়ে আসে ব্যোমব্রহ্ম। অবশ্য কৃতিত্বটা একা ব্যোমব্রহ্মেরই নয়, বি-মা আর চু-গাও যথেষ্ট সাহায্য করেছে তাকে, তবে তারাও ভয়ানক বিপদের মুখে ব্যোমব্রহ্মের ধীর স্থির আচরণের প্রশংসা করেছে মুক্ত কণ্ঠে।

এরপর আর কোনো বড় ঝামেলা হয়নি। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলি নিখুঁত-ভাবে কাজ করে গেছে। অভিযাত্রীরা শুধু পালা করে কনট্রোল বোর্ডে থেকেছে, মেশিনগুলোর কাজের তদারকী করেছে। কিন্তু মার্কোসাপলাস থেকে আর কোনো সঙ্কেত শুনতে পায়নি তারা। ব্যাপারটা খুবই বিস্ময়কর বলে মনে হচ্ছিল ব্যোমব্রহ্মের। এ নিয়ে অভিযাত্রীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও করেছে সে, কিন্তু কেউই এর কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারেনি।

বিলক্ষণ খিদে পেয়েছিল। খাবার-ঘরে গিয়ে একটা টংলিন মিশ্র ধাতুর তৈরী হালকা চেয়ার টেনে বসে পড়ল স্পেস-কম্যাণ্ডার ব্যোমব্রহ্ম। এই টংলিন মিশ্র ধাতু কিন্তু পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। আনতে হয় মঙ্গল গ্রহ থেকে। বিভিন্ন গ্রহে এই মিশ্র ধাতু রপ্তানী করে মঙ্গল গ্রহ বেশ মোটা রকমের আন্তর্গ্রহ শুল্ক আদায় করে থাকে।

কিচেন রবট এগিয়ে এসে অর্ডার নিয়ে গেল। ফিরে এলো বিম্বিং-এর

মাংসের টিউব, কফির টিউব আর ট্রয়ুামের টিউব নিয়ে, সঙ্গে অবশ্যই দু'রকমের ভিটামিনের টিউব।

টিউবের ছিপি খুলছে এমন সময়ে প্রথমে এলো টিম্বালটিয়া। তার রহস্যময় চোখের অসুখ সেরে গেছে। টেবিলে ট্রুয়ামের টিউব দেখেই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলো সে, আর সেই চীৎকার শুনেই যেন একে একে হাজির হ'ল জোম্বালজিয়া, জা-রো, চু-গা আর সং-লা। বি-মা আসতে পারল না, কারণ তার তখন কনট্রোল বোর্ড ডিউটি চলছিল।

আনন্দোৎফুল্ল স্বরে জোম্বালজিয়া বলল,—'ডাইনিং টেবিলে ট্রুয়ামের টিউব! ব্যাপার কি স্পেস-কম্যাণ্ডার? এটা কিসের সেলিব্রেশন?

ব্যোমব্রহ্ম মুচকি মুচকি হাসছিল, বলল,—'আমরা এখন অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়ে পা রেখেছি, সেজন্যই সবাই মিলে একটু আনন্দ করা আর কি।'

একটা টিউবের মুখ খুলতে খুলতে দৈত্যাকায় চু-গা বলল,—'কি রকম?'

'কিছুক্ষণ আগেই আমরা ক্রুগার-৬০ যুগ্ম তারাকে পেছনে রেখে হলদে তারা মার্কোসাপলাসের দিকে যাত্রা শুরু করেছি। সেখানে পৌঁছুতে আর দেরী হবে না।'

'তবু, আর কতদিন লাগবে স্পেস-কম্যাণ্ডার?' একটা টিউব মুখে পুরে অবরুদ্ধ স্বরে বলল সং-লা।

'হিসেবটা কষতে দিয়েছি কম্পিউটারকে, কিছুক্ষণের মধ্যেই উত্তর পেয়ে যাবো।'

টিম্বালটিয়া বলে উঠলো,—'আমিও একটা সুসংবাদ দিতে পারি কিন্তু—'

'কি রকম, কি রকম,—' হৈ হৈ করে উঠলো অভিযাত্রী দল।

ব্যোমব্রহ্ম স্মিত মুখে তাকালো টিম্বালটিয়ার দিকে, 'বলে ফেল, বলে ফেল টিম্বালটিয়া। চোখে আরও বেশী দেখছ বুঝি?'

'আরে না, সে সব নয়, সত্যিই সুসংবাদ এটা।'

বিরক্ত হয়ে জা-ব্লো বলল,—'সেই তখন থেকে তো শুধু সুসংবাদ, সুসংবাদই করছ। একবার বলেই ফেল না, আমরাও একটু চাখি।'

'বাবা, বাবা,—ধৈর্য বুঝি ধরে না, না ? শুনুন তবে। আজ সকালে আমার কনট্রোল-বোর্ডে ডিউটি ছিল, তখনি স্টেরিওগ্রাফে মার্কোসাপ-লাসের সেই বিচিত্র সংকেতটা ধরা পড়েছে। এবার বেশ জোরালো !'

কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপ করে রইলো। তারা যে বুনো হাঁস তাড়াচ্ছে না এই উপলব্ধি সবাইকে মৌন মূক করে রাখল।

মৌন ভঙ্গ করল ব্যোমব্রহ্ম নিজে, বলল,—'জোরালো তো হবেই, কাছাকাছি এসে পড়েছি তো ?'

ব্যোমব্রহ্মার উল্টোদিকে পাশাপাশি চেয়ারে বসে ছিল চু-গা আর জোম্বালজিয়া। ওদের চোখে কী এক বার্তা বিনিময় হ'ল, আলগোছে চু-গা-র হাতের ওপর নিজের হাতখানি রাখল জোম্বালজিয়া। আড়-চোখে দেখে মনে মনে হাসল ব্যোমব্রহ্ম। গ্রহমণ্ডলে থাকলে যে পূর্ব-রাগের পালা শেষ হতে দু'চার বছর সময় নিত, সেই ভালোবাসার কুঁড়িটি মহাকাশযানের অখণ্ড নিঃসঙ্গতার মাঝে ফুটে উঠেছে এই কয়েক মাস সময়ের মধ্যেই।

অন্য অভিযাত্রীরা গভীর আগ্রহে তাদের স্পেস-কম্যাণ্ডারের মুখে তাকিয়েছিল। সেদিকে তাকিয়ে ব্যোমব্রহ্ম বলল,—'আমরাও একটা সঙ্কেত পাঠাবো ওদের কাছে। মার্কোসাপলানরা বুঝুক যে এই অসীম বিশ্বের কোনো এক জায়গায় তাদের সঙ্কেত ধরা পড়েছে, এবং সেখানকার প্রাণীদের একটি দল ছুটে আসছে তাদের কাছে প্রেম ও প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হতে !'

ব্যোমব্রহ্মের কথা শুনে অভিযাত্রী-বিজ্ঞানীরা হর্ষধ্বনি করে উঠলো। সে শব্দ মিলিয়ে যেতে আবার বলতে লাগল ব্যোমব্রহ্ম—'হয়তো আর দশমাস কি এক বছর পরে আমাদের স্পেস-শিপ মার্কোসাপ-লাসের আকর্ষণ বলয়ে ধরা পড়বে। তখন আমাদের ফোটন চালিত মহাকাশযানের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলি মার্কোসাপলাস তার সম্পর্কে সব রকমের তথ্য আহরণ করে আমাদের জানাবে।...'

—'আর আমরা ওখানে নেমে জানতে পারবো মার্কোসাপলানদের সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য—' ফস করে বলে উঠলো টিম্বালটিয়া,—'উঃ, আনন্দে আমার নাচতে ইচ্ছে করছে ?'

চার চোখ কপালে তুলে চ্যাপ্টা-মুখ জোম্বালজিয়া ব'লে উঠলো,—'আহা, তাই বলে এখনি নাচ শুরু কোরো না যেন, শুনলে তো স্পেস-কম্যাণ্ডার কী বললেন ? ওখানে যেতে এখনো বছর খানেক দেরী আছে, এখন থেকে নাচলে তোমার পা ব্যথা হয়ে যাবে।'

একথার জবাব না দিয়ে শুধু কটমট চোখে জোম্বালজিয়ার মুখে তাকালো টিম্বলটিয়া।

ওদের ঝগড়া মিটিয়ে দেবার জন্য ব্যোমব্রহ্ম বলল,—'একটা বছর তো দেখতে দেখতে কেটে যাবে ঘুমের ভেতরে। আজ রাত্রের ডিনার পার্টির পর সবাই ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড় দুই মাসের জন্য। জেগে থাকব শুধু আমি আর বি-মা। পরের ডিউটি পড়বে চু-গা আর জোম্বালজিয়ার।'

তাদের প্রণয় কাহিনীটা ব্যোমব্রহ্মের অজানা নয় দেখে সুন্দরভাবে ব্লাশ করল জোম্বালজিয়া। ওকে অস্বস্তির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য চু-গা বলে উঠলো, 'আজ তা হ'লে স্পেশাল ডিনার ? কি কি মেনু হবে বলুন স্পেস-কম্যাণ্ডার ?'

'মেনু শুনবেন ? হোটেল রিজকে হার মানাবে। প্রথমেই বিস্মিং আর বন-মোরগের মাংসের টিউব।'

'চমৎকার, চমৎকার !'—বলে উঠলো জা-স্নো।

'তারপর আটরকমের ভিটামিন যুক্ত মল্ট্। পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদের কলোনীতে উৎপন্ন সঞ্চালী গমের নির্যাস। চকোলেট বার। মঙ্গলের বিশেষ পুষ্টিকর খাবার সাঞ্চা আর প্রত্যেকে দু'গ্লাস করে জুম।'

এবারে আর ধরে রাখা গেল না কাউকে। সবাই চেয়ার ছেড়ে ভারশূন্য নাচে মেতে উঠলো। খুশী মনে ব্যোমব্রহ্মও যোগ দিল ওদের ঐ আনন্দ উৎসবে। শুধু একটিবারের জন্য তার মনে বোম্বালভিয়ার মুখখানা ভেসে উঠলো। আহা ? সে যদি আজ কাছে থাকতো !

বিশাল কনট্রোল বোর্ডের মাথার কাছে লাল বাতিটা জ্বলছিল। ডান পাশের প্রকাণ্ড স্ক্রীনে বিরাট আকারের তারা মার্কোসাপলাসের ছবি ক্রমেই বড় হ'য়ে উঠছিল। দেখতে দেখতে তার বিপুল শরীর ছেয়ে ফেলল গোটা স্ক্রীনটাকে। স্পেস-শিপের ফোটন-মোটরগুলো থেমে গিয়েছিল, চলছিল শুধু প্ল্যানেটারী মোটরগুলো। স্বয়ংক্রিয় অক্জিলিয়ারী ব্রেকগুলো ফোটন মহাকাশযানের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করছিল। ব্যোমব্রহ্ম, চু-গা আর জোম্বালজিয়া কনট্রোল বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে শ'পাচেক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যন্ত্রের ওপরে নজর রাখছিল। স্ক্রীনের সামনে দাঁড়িয়ে অভিনিবেশ সহকারে হলদে তারাটাকে দেখছিল টিম্বালটিয়া, বি-মা, সং-লা আর জা-রো।

সবার মুখে উদ্বেগ আর আশঙ্কার ছাপ। কীভাবে নেবে তাদের মার্কোসাপলাসের প্রাণীরা? বন্ধুভাবে, না শত্রুভাবে? একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ব্যোমব্রহ্ম বলে উঠলো, 'নাঃ, আর কোনো ভয় নেই। নিখুঁতভাবে কাজ করছে মহাকাশযানের মেশিনগুলো। গ্রহমণ্ডল সরকারের স্পেস-ইঞ্জিনীয়ারদের ধন্যবাদ।'

চু-গা বলল,—'আর কিছুক্ষণ পরেই আমরা ঐ হলদে তারা মার্কোসাপলাসের চারদিকে ঘুরপাক খেতে খেতে তাকে আরও ভালো করে দেখবার, তার সম্পর্কে সব রকমের তথ্য আহরণের সুযোগ পাবো। আমাদের অভিযানের শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছি আমরা।'

অভিযাত্রী-বিজ্ঞানীদের মনের উত্তেজনা তখন চরমে উঠেছে। কী আছে ঐ হলদে তারাতে? সৌরজগত থেকে দীর্ঘতম পথ পাড়ি দিয়ে এসে শেষ পর্যন্ত কী দেখতে পাবে তারা? সত্যিই কি তাদের মতো কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী আছে ঐ তারাতে? নাকি সঙ্কেতগুলো কোনো অজ্ঞাত প্রাকৃতিক নিয়মে আপনা থেকেই প্রচারিত হয়েছে? ঐ তারাতে যদি কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী থাকেও তা হ'লে তারা কি রকম দেখতে, কেমন হবে তাদের আচরণ, কেমন তাদের মানসিকতা? অভিযাত্রী দলকে তারা বন্ধুভাবে গ্রহণ করবে, না শত্রুভাবে?

জীব-বিজ্ঞানী চু-গা বলল,—'এই হলদে তারার সৌরজগতের বাইরে,

গ্যালাক্সীর এক প্রান্তে। এখানে যদি জীবনের বিকাশ হয়েও থাকে তা হ'লে তা যে পৃথিবী বা সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের অনুরূপই হবে তা ভাবা ভুল। আমাদের সৌরজগতে জীবনের বিবর্তন মোটামুটি একই ধারায় ঘটে গেছে, ফলে পৃথিবীর মানুষ ও সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের প্রাণীদের মধ্যে একটা মূলগত ঐক্য আছে প্রকৃতি ও মানসিকতায়, আচার ও আচরণে। কিন্তু হলদে তারার প্রাণীরা যে দেখতে কেমন তা আমাদের কল্পনাতেও আসছে না।'

সং-লাও চু-গা-র কথার সমর্থন করে বলল,— 'অভাবিত অনেক কিছুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে আমাদের।'

'তার আগে তারাটার আরও কাছাকাছি যাওয়া যাক,' ব'লে কয়েকটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের বোতাম টিপে দিল স্পেস-কম্যাণ্ডার ব্যোমব্রহ্ম। যন্ত্রগুলো সক্রিয় হয়ে উঠলো, ছোট ছোট ডায়ালে তাদের কাঁটাগুলো নড়তে লাগল। আস্তে আস্তে কাৎ হয়ে গেল স্পেস-শিপটা, নিম্নমুখী হয়ে মার্কোসাপলাসের ঘন বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করল, আরও নীচে গিয়ে তারাটার চারপাশে ঘুরতে লাগলো।

কোর্স প্লটিং স্ক্রীনের দিকে তাকালো ব্যোমব্রহ্ম। দেখলো স্পেস-শিপটা তখন তিনশ মাইল দূরে থেকে প্রদক্ষিণ করছে মার্কোসাপলাসকে। খালি চোখেও ধু ধু অসীম প্রান্তর চোখে পড়ছিল সবার।

মার্কোসাপলাসের কাছাকাছি আসার ফলে তার আকর্ষণ বলয় গ্রাস করল স্পেস-শিপটাকে। এতদিন ভারহীন্ অবস্থায় থাকবার পর মাত্র ০·৫ (দশমিক পাঁচ) "জি" মাত্রার মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ক্ষেত্রে পড়াতেই সবার মনে হচ্ছিল যে হাত,পা গুলো সব যেন সীসার মত ভারী হয়ে হয়ে গেছে। ব্যতিক্রম হ'ল শুধু শনির বলয় থেকে আসা জা-স্লো আর বৃহস্পতির দুই নম্বর চাঁদ থেকে আসা চু-গার ক্ষেত্রে, কারণ তাদের গ্রহে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর তুলনায় অনেক, অনেক বেশী।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তিটাকে সইয়ে নেবার পর ইলেকট্রনিক ইনভারটার মেশিনটি চালু করে দিল ব্যোমব্রহ্ম। অত্যন্ত শক্তিশালী লেন্স হলদে তারাটার দিকে তাকালো, তার দেহটাই ফুটে উঠলো কনট্রোল বোর্ডের

বিশাল স্ক্রীনে, ভেসে উঠলো মার্কোসাপলাসের দৃশ্যমান অংশগুলো। দেখা দিল রুক্ষ ধূসর আদি-অন্তহীন প্রান্তরে হিমালয়ের চেয়েও শত শত গুণ উঁচু পাহাড়, বিশাল নদী, আদিগন্ত সমুদ্রের সীমাহীন বিস্তার। কিন্তু অতদূর থেকে ইন্‌ভারটারের ইলেকট্রনিক ক্যামেরার চোখেও সভ্যতার কোনো নিদর্শন, কি প্রাণী-জগতের কোনো প্রমাণ আবিষ্কার করা সম্ভব হচ্ছিল না।

ইতিমধ্যে স্পেস-শিপের অন্যান্য যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল অভিযাত্রী-বিজ্ঞানীরা। কখন কাকে কী করতে হবে এ বিষয়ে অনেক আগেই সবাইকে তালিম দিয়ে রেখেছিল স্পেস-কম্যাণ্ডার ব্যোমব্রহ্ম, তাই প্রত্যেকেই যান্ত্রিক নিপুণতার সঙ্গে নিজের নিজের কাজ করে যাচ্ছিল। মার্কোসাপলাসের বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাসের অনুপাত ও পরিমাণ, বায়ুমণ্ডলের গভীরতা, তারাপৃষ্ঠের তাপ, গ্যাসের চাপ, বিকিরণ, চুম্বক ক্ষেত্রে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির পরিমাণ, মার্কোসাপলাসের আয়তন, তার আহ্নিক ও বার্ষিক গতির বেগ, মহাজাগতিক রশ্মিপাতের পরিমাণ ইত্যাদি সমস্ত রকমের প্রয়োজনীয় তথ্য বিভিন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে রেকর্ড হয়ে যাচ্ছিল, বিজ্ঞানীরা তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করছিলো, কারণ সামান্য একটু ভুলের জন্য সমস্ত অভিযাত্রী সহ বিশাল মহাকাশ-যানখানার ধ্বংস হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল।

রেকর্ড থেকে মুখ তুলে সং-লা ঘোষণা করল 'হলদে তারার বায়ুমণ্ডলের গভীরতা পনেরো হাজার মাইল। বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাসের অনুপাত ঃ অক্সিজেন শতকরা এগারো ভাগ—'

চেঁচিয়ে উঠলো টিম্বালটিয়া,—'অনেকটা পৃথিবীর মতো। চমৎকার। পরিবেশ দেখছি প্রাণের বিকাশের বিলক্ষণ অনুকূল।'

হাত তুলে তার উচ্ছ্বাসটুকু থামিয়ে দিল ব্যোমব্রহ্ম,—'থামো টিম্বালটিয়া, সবটুকু শুনতে দাও। হ্যাঁ, বলে যাও সং-লা,—আর কি কি গ্যাস আছে মার্কোসাপলাসের বায়ুমণ্ডলে?'

উৎফুল্ল কণ্ঠে আবার বলতে লাগল সং-লা,—'এ্যামোনিয়া আছে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ, নাইট্রোজেন ষোলো ভাগ, কার্বনডাই অক্সাইড

আট ভাগ আর হাইড্রোজেন দশ ভাগ। জলীয় বাষ্পের হিসেব এর মধ্যে নেই, আরও নীচে না নামলে সে হিসেব সঠিক হবে না।'

'আর বায়ুমণ্ডলের চাপ কত সং-লা ?

'আড়াই এ্যাটোমোস্ফিয়ার—'

'তার মানে পৃথিবীর তুলনায় আড়াই গুণ বেশী ?'

'হ্যাঁ, স্পেস-কম্যাণ্ডার। আমাদের মাস্‌ক পরতে হবে।'

চু-গা বিকিরণের দিকটা দেখছিল। তার দিকে মুখ ফেরাতেই বলে উঠলো সে,—'নানান ধরনের বিকিরণের তথ্য পাওয়া যাচ্ছে স্পেস-কম্যাণ্ডার, রেডিও এ্যাক্‌টিভ্‌ এনার্জির ক্ষীণ বিকিরণ ধরা পড়েছে এই যন্ত্রে। নীচে নেমে ভালোভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে সেগুলোর।'

জা-রো তার রিপোর্ট পেশ করল,—'চুম্বক ক্ষেত্র খুবই ক্ষীণ, নেই বললেই চলে, তবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এক 'জি'র কিছু বেশীই হবে। ফলে তারার ওপর দিয়ে চলাফেরা করতে বিলক্ষণ কষ্ট হবে সবার।'

এ্যাসট্রোফিজিসিস্ট টিম্বালটিয়া বলল,—'আয়তনের তুলনায় এর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে খুব কমই বলতে হবে স্পেস-কম্যাণ্ডার। তারাটা আয়তনে বিরাট, পৃথিবীর চেয়ে দেড়শ' গুণ বড়। তারাটা বহুদিন আগেই মরে গেছে। বর্তমানে তিন কোটি মাইল দূরে থেকে একটা লাল তারাকে প্রদক্ষিণ করছে। সময় লাগছে পার্থিব পাঁচ বছরে একবার, অর্থাৎ গতি খুবই শ্লথ। মার্কোসাপলাসের আহ্নিক গতি একটু অন্য ধরনের। অর্থাৎ পৃথিবীর মতো নয়। পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদের মতোই এমনভাবে রক্তিম তারাটাকে প্রদক্ষিণ করছে যাতে তার এক-পিঠ বরাবর 'রক্ত-সূর্যের' দিকে থাকে। অন্য পিঠে তাই চির-অন্ধকার। আহ্নিক গতি অন্য রকমের হওয়ায় মার্কোসাপলাসের আবহাওয়া সৌরগ্রহ থেকে একেবারেই আলাদা।'

এতক্ষণ ধ'রে একটি কথাও বলবার সুযোগ পায়নি বি-মা, উসখুস করছিল সে, টিম্বালটিয়া থামতেই তড়বড় ক'রে বলতে লাগল সে,—'তারার আলোকিত পিঠের তাপমাত্রা চোদ্দ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

টপোগ্রাফী পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে বিরাট প্রান্তরের মাঝখানে বিশাল বিশাল পাহাড় ছড়িয়ে আছে চারিদিকে, এক একটা প্রায় হাজার মাইল উঁচু। মার্কোসাপলাসের আয়তনের পাঁচ ভাগের মধ্যে দুই ভাগ স্থল আর তিন ভাগ জল। এক অখণ্ড সমুদ্র তারাটার আলোকিত আর অন্ধকার দুই অংশেই ছড়িয়ে আছে।'

জোম্বালজিয়া বলল,—'কোনো প্রাণীর সন্ধান এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি, তবে পাহাড়ের গায়ে গায়ে আর ধু ধু প্রান্তরে এক ধরনের উদ্ভিদ দেখা যাচ্ছে, যদিও তাদের আকৃতি ও প্রকৃতির ব্যাপারে এতদূর থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।'

সব রকমের তথ্য কমপিউটারে ঢুকিয়ে দেওয়া হ'ল বিচার-বিশ্লেষণের জন্য। কমপিউটারের কাছ থেকে নিরাপদ সঙ্কেত না পাওয়া পর্যন্ত কোনো অজানা গ্রহ বা তারায় কিছুতেই নামা চলে না।

ব্যোমব্রহ্ম বলল,—'কমপিউটার কি বলবে তা জানি না, তবে আমার অভিজ্ঞতা বলছে যে মার্কোসাপলাসে যখন উদ্ভিদ জন্মাচ্ছে তখন নামলে কোন বিপদের আশঙ্কা নেই।'

ব্যোমব্রহ্মের কথা শেষ হতে না হতেই কমপিউটারের জবাব পাওয়া গেল : অবতরণ নিরাপদ, তবে সাবধান!

উদ্বেগভরা চোখে অভিযাত্রী-বিজ্ঞানীরা ব্যোমব্রহ্মের মুখের দিকে তাকালো। যে যত বড়ই হোক, স্পেস-শিপ নামবার বা উঠবার হুকুম দেবার অধিকার একমাত্র স্পেস-কম্যাণ্ডারেরই আছে। এতদূর এসেও যদি মার্কোসাপলাসে না নেমে ফিরে যাবার হুকুম দেয় ব্যোমব্রহ্ম তা হ'লেও কারুর বলবার কিচ্ছু থাকবে না।

ভুরু কুঁচকে কয়েক মিনিট চিন্তা করল ব্যোমব্রহ্ম। মার্কোসাপলাস সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যগুলি আর একবার দেখল। কমপিউটার কি কারণে সাবধান হ'তে বলেছে তার হদিস খুঁজল, কিন্তু কিছুই পেল না। নিজের ওপর অসীম আস্থা ব্যোমব্রহ্মের, সে একটু ঝুঁকি নিয়েও নামবার সিদ্ধান্ত নিল।

অভিযাত্রী-বিজ্ঞানীদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। উৎসাহে, উদ্দীপনায়

টগবগ করতে লাগল তারা। জোম্বালজিয়া এগিয়ে এসে চু-গার পাশে দাঁড়াল, ফিসফিস ক'রে কী যেন বলল,—কান খাড়া করে রেখেও শুনতে পেল না টিম্বালটিয়া। চু-গা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। জোম্বালজিয়া চু-গার একটা হাত চেপে ধরল।

ব্যোমব্রহ্ম বলল,—'আমরা এবার মার্কোসাপলাসে অবতরণ করব। আপনারা সবাই কেবিনে গিয়ে শক্-প্রুফ আসনের গদীতে আশ্রয় নিন। অবতরণের সময়ে কি কি করতে হয় তা চার্টে লেখাই আছে, ওসব নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন।'

নীরবে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে কেবিনে চলে গেল সবাই। কনট্রোল বোর্ডের কাছে একা দাঁড়িয়ে রইলো ব্যোমব্রহ্ম। অভিযাত্রী-দের কয়েক মিনিট সময় দেবার পরে এগিয়ে এসে কনট্রোল বোর্ডের মাথার ওপরে থাকা একটা সবুজ বোতামে আঙ্গুল ছোঁয়ালো সে। ডায়ালের লাল-নীল-হলদে-কমলা রং-এর আলোয় তার মুখখানা কঠোর ও সতর্ক দেখাচ্ছিল।

দেখতে দেখতে মার্কোসাপলাসের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণরত মহাকাশ-যানটির অরবিট সঙ্কুচিত হ'য়ে এলো, প্রতি পাকেই মার্কোসাপলাসের আরও কাছাকাছি চলে আসতে লাগল সেটা। এমনি করে বার কয়েক পাক খাবার পর হঠাৎ অরবিট ছেড়ে তির্যক রেখায় হলদে তারার অলোকিত অংশে নামবার জন্য এগিয়ে গেল বিশাল কৌটন স্পেস-শিপখানা।

মার্কোসাপলাসের ভূ-পৃষ্ঠের যে জায়গাটিতে স্পেস-শিপের নামবার কথা সেখানে একটা ছোটখোটো পাহাড় দেখা গেল। ব্যোমব্রহ্ম একটা বোতাম টিপল। দু নম্বর কমপিউটার মেশিনের নির্দেশে স্পেস-শিপের নাকের কাছে বসানো কামান সক্রিয় হ'য়ে উঠলো। স্ক্রীনে তাকিয়ে ব্যোমব্রহ্ম দেখল যে সুপার ডিসইন্টিগ্রেটিং রশ্মির ছোঁয়াতে অতবড় পাহাড়টা রেণু রেণু হ'য়ে একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে। সেই পাহাড় কাটা সমভূমির ওপর আস্তে আস্তে নেড়ে পড়ল ব্যোমব্রহ্মের মহাকাশ-যান। একেবারে নিখুঁত অবতরণ। মহাকাশযানের টেলিস্কোপিক পা

তিনটে নামবার ঝাঁকুনিটাকে সহ্য করে নিল সুন্দরভাবে। বার কয়েক দোলার পর একেবারে স্থির হয়ে গেল মহাকাশযানটি,—যেন দীর্ঘ পথের শেষে শ্রান্ত পথিক বিশ্রাম নিতে লাগল।

ওষুধের পিল খাওয়া অভিযাত্রীরা আধ ঘণ্টার জন্য একেবারে নিঝুম হ'য়ে রইলো। মহাকাশযানের ঝাঁকুনি যত কমই হোক না কেন, রক্ত-মাংসের প্রাণীর পক্ষে তার ধকল সামলানো খুবই কঠিন। অমন যে ব্যোমব্রহ্ম, সে-ও নামবার পূর্ব মুহূর্তে সব ঠিক আছে দেখে নিজের হাইড্রলিক আসনে আশ্রয় নিয়েছিল।

কিন্তু অভিযাত্রী-বিজ্ঞানীরা নিঝুম হ'য়ে থাকলেও মহাকাশযানের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলি সক্রিয় ছিল। নানা ধরনের তথ্যে মাইক্রোফিল্ম আর মইক্রোহুনিয়েভ্ বোঝাই হয়ে যাচ্ছিল।

আধঘণ্টা কেটে গেল, কেটে গেল ওষুধের প্রভাব। ব্যোমব্রহ্ম ও অভিযাত্রী-বিজ্ঞানীরা নড়ে চড়ে বসল, তার পরেই ছুটে গেল জানলার ধারে।

যতদূর চোখ যায় ধু ধু প্রান্তর। রক্ত-সূর্যের হলদে রোদে বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল তারাটাকে। মাঝে মাঝে নানান ধরনের অচেনা উদ্ভিদ, পাহাড়ের গায়ে গায়ে পত্রবহুল দীর্ঘ দেহ বনস্পতি। বহু দূরে বিসর্পিত রেখায় একটি নদী চলে গেছে। পাহাড়ের চূড়ায় জমাট এ্যামোনিয়া হলদে রোদে সোনার মতো চকচক করছিল। আকাশ উজ্জ্বল কালো, রোদের তেজ কম থাকায় দু-চারটে তারাও দেখা যাচ্ছিল।

কিন্তু কোনো জীবন্ত প্রাণী দেখতে পেল না তারা।

ব্যোমব্রহ্ম সোজা চলে গিয়েছিল কনট্রোল রুমে। নামবার পর আধ ঘণ্টার মধ্যে পাওয়া তথ্যগুলো বিশ্লেষণ ক'রে দেখল সে।

চু-গা এসে দাঁড়াল তার কাছে, বলল—'অভিযাত্রীরা তো হলদে তারার বুকে পা রাখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে স্পেস-কমাণ্ডার,—'

মৃদু হেসে ব্যোমব্রহ্ম বলল,—'তা তো হবেই, এক বছরের ওপর একই জায়গায় আটকে থাকতে কার আর ভালো লাগে বলো?'

'তা হ'লে আপনি অনুমতি দিচ্ছেন ?'

'নিশ্চয়ই। তবে প্রত্যেককেই অজানা মহাজাগতিক রশ্মি নিরোধক পোশাক পরে নিতে হবে। পোশাক আছে মহাকাশযানের ফোল্ডে। সবাইকে তৈরী হ'য়ে এয়ার-লক চেম্বারে যেতে বলো।'

'আচ্ছা—' ব'লে তাড়াতাড়ি চলে গেল চু-গা।

মহাকাশযানের হাইড্রলিক পায়া তিনটি তিরিশ ফুট লম্বা। একটা এস্কালেটার নামিয়ে দিল ব্যোমব্রহ্ম, তারপর বিশেষ পোশাক পরে সে-ও চলে এলো এয়ার লক চেম্বারে।

ক্ষতিকর মহাজাগতিক রশ্মি নিরোধক পোশাকের সঙ্গে একটি ক'রে, অডিওস্কোপও লাগানো ছিল। পরস্পরের সঙ্গে দূর থেকে কথা বলবার জন্য।

ব্যোমব্রহ্মের নির্দেশে একটি রবট এসে এয়ার-লকের বায়ুর চাপ বাড়িয়ে দিল। এয়ার-লকের চেয়ারের বায়ুর চাপ যখন বাইরের বায়ুর চাপের পাঁচগুণ হ'ল তখন হাইড্রলিক জ্যাক বাইরে বার হবার এয়ার-টাইট দরজা খুলে দিল। ভেতরের প্রচণ্ড বায়ুর চাপ ব্যোমব্রহ্ম ও অন্যসব অভিযাত্রী-বিজ্ঞানীদের খুব জোরে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিল বাইরে, পড়তে পড়তে সামলে নিল সবাই। ছোট ব্যালকনীর মতো জায়গা, তিরিশ ফুট নীচেই হলদে তারার মাটি, সামনে দিয়ে ছোট এস্কালে-টারটা অনবরত ওঠানামা করছে।

একটু দম নিয়ে ব্যোমব্রহ্ম বলল,—'এয়ার-লকের এয়ারপ্রেশার এত বাড়িয়ে দিলাম কেন জানো টিম্বালটিয়া ?'

টিম্বালটিয়ার চার চোখ তখন নীচের দিকে, টেলিস্কোপিক হাত দিয়ে তখনো ব্যালকনীর রেলিং ধ'রে ছিল, চ্যাপ্টা মুখ তুলে বলল, 'জানি স্পেস-কম্যাণ্ডার,—'এয়ার-লকের বায়ুর চাপ বাইরের থেকে চার পাঁচ-গুণ বেশী থাকার জন্য বাইরের কোনো ক্ষতিকারক পদার্থ বা বীজাণু অথবা জীবাণু এয়ার-লকে ঢুকতে পারবে না। স্পেস-শিপকে সংক্রমণের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই এই ব্যবস্থা।'

'শতকরা একশ' নম্বর পেলে তুমি। পুরস্কার স্বরূপ মার্কোসাপলাসের

বুকে প্রথম পা রাখবার কৃতিত্ব তোমারই হবে। যাও, এগিয়ে এস্‌কালেটারে পা রাখো।'

অজানা তারা মার্কোসাপলাসের বুকে পা রেখে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো ব্যোমব্রহ্ম, টিম্বালটিয়া, জোম্বালজিয়া, চু-গা, বি-মা, সং-লা, আর জা-রো। এই তারার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রায় দেড় "জি" হওয়ায় চলাফেরা করতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল প্রায় প্রত্যেকেরই, মনে হচ্ছিল যে পা-গুলো যেন মার্কোসাপলাসের মাটিতে গেঁথে গেছে। বুধের মেয়েদের আবার ছোট ছোট পা, তারা তো হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল।

ইলেকট্রনিক দূরবীন দিয়ে দূরে তাকালো সবাই। মহাকাশযানের জানলা দিয়ে যা দেখেছে এখানেও তারই পুনরাবৃত্তি দেখল। চারদিকে নীল রং-এর রুক্ষ পাথুরে মাটি, আর শুধু পাহাড়। অবিরাম উল্কাপাতে মাটিতে ছোট বড় অনেক গর্ত। কোনো কোনোটা লম্বায় চওড়ায় মাইল দুই চারও হবে। আকাশছোঁয়া পাহাড়ের চূড়ায় জমাট তুষার। তার এ্যামোনিয়ার মুকুট হলদে রোদে সোনা হ'য়ে গিয়েছিল, ঝকঝক করছিল। অজানা গাছপালা, লতাগুল্ম সবই গাঢ় হলুদ রং-এর। চারদিক খুব ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করেও পাখি বা কীট-পতঙ্গ বা জন্তু-জানোয়ারও চোখে পড়ল না তাদের। গাছগুলো পৃথিবীর মতোই, তাদের শেকড় মাটির গভীরে প্রোথিত। বায়ু সঞ্চালন না থাকায় তাদের ঢাউস পাতাগুলো নিথর, নিশ্চল।

দেখেশুনে ইলেকট্রনিক দূরবীনটা চোখ থেকে নামিয়ে নিল টিম্বালটিয়া, ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল,—'কই উন্নত দূরে থাক অনুন্নত প্রাণীর দেখাও যে পাচ্ছি না সেম্প-কম্যাণ্ডার ? আমরা কি তা হ'লে ভুল তারায় নামলাম ?'

'তা কি ক'রে সম্ভব টিম্বালটিয়া ? সতর্ক নিপুণভাবে, কমপিউট করা পথে নির্ভুলভাবে ছুটে এসেছে আমাদের ফোটন মহাকাশযান। মাঝে চারবার সঙ্কেতও পেয়েছি আমরা, কাজেই ভুল হবার তো কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।'

গম্ভীর ভাবে সং-লা বলল,—'সে কথা ঠিক, আবার এখানে যে কোনো জীবিত প্রাণী নেই সে কথাটাও ভুল নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে সঙ্কেত পাঠাচ্ছিল কারা?'

জা-রোও আলোচনায় যোগ দিল, বলল,—'নামবার ক'দিন আগেও তো খুব জোরালো সঙ্কেত ধরা পড়েছিল মহাকাশযানের স্টেরিওগ্রাফ যন্ত্রে, আর সে সঙ্কেতের উৎস যে এই হলদে তারাটাই, তা-ও তো আমাদের কমপিউটার পরিষ্কারভাবেই বলে দিয়েছিল।'

'কাজেই আমরা যে সঠিক ঠিকানাতেই পৌঁছেছি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকাই উচিত নয়—' ঝপ করে বলে উঠলো চু-গা।

বি-মা বলল,—'আমিও এ বিষয়ে চু-গার সঙ্গে একমত। এখানে পাচ্ছি না বলেই যে এই বিশাল তারার অন্য কোথাও বুদ্ধিমান প্রাণীরা বাস করছে না এরকম ধারণা করা ঠিক হবে না। আমার মনে হয় যে আমরা একটি মাত্র জায়গায় দাঁড়িয়ে না থেকে ট্যাঙ্ক-ট্যাক্সিতে করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে ভালো হয়। এতে যদি বুদ্ধিমান প্রাণীর দেখা না-ও পাই, তাহলেও এই নিঃসঙ্গ হলদে তারা সম্পর্কে নানা রকমের মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে পারব আমরা। বিশেষ করে ধাতু বিজ্ঞানী জা-রো দুষ্প্রাপ্য বা সৌরজগতে পাওয়া যায় না এমন অনেক অজ্ঞাত ধাতুর সন্ধান করতে পারবে।'

বি-মা-র প্রস্তাবটা সবারই মনঃপূত হল, সবাই সমর্থন করল তার বক্তব্যকে। ব্যোমব্রহ্ম ফিরে গেল মহাকাশযানে, সেখানে জাহাজের খোলে ট্যাঙ্ক-ট্যাক্সি রাখা আছে।

ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই তিনটে ট্যাঙ্ক-ট্যাক্সি নেমে এলো মহাকাশযান থেকে। এই ট্যাক্সিগুলো আকারে ছোট। এদের সারা শরীর সেলেনিয়াম এ্যালয়ের দুর্ভেদ্য বর্মে ঢাকা। চলে আণবিক শক্তিতে। গতিবেগ অবশ্য খুব বেশী নয়, ঘণ্টায় দু'হাজার মাইল মাত্র। তবে জল, পাহাড়, খাদ, গর্ত, মরুভূমি, জলাভূমি, কিছুই এদের চলার পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। আর সে জন্যই এই ধরনের অভিযানের পক্ষে খুবই উপযোগী এগুলো।

ছয় জন অভিযাত্রী তিন ভাগ হয়ে তিনটি ট্যাঙ্ক-ট্যাক্সিতে চেপে বসল। হাত নেড়ে তাদের বিদায় জানালো ব্যোমব্রহ্ম। তথ্য সংগ্রহ অভিযানে বেরিয়ে পড়ল অভিযাত্রী বিজ্ঞানীরা, মুহূর্তের মধ্যে চোখের আড়ালে চলে গেল তারা।

ব্যোমব্রহ্ম ফিরে এলো কনট্রোল রুমে। বেতারে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করাই হবে তার কাজ।

হাজার সাতেক মাইল অতিক্রম করে ট্যাঙ্ক-ট্যাক্সি থামালো জা-রো। তার সঙ্গে আছে টিম্বালটিয়া। এখানেও সেই একই দৃশ্য। উঁচু-নীচু উপত্যকা, ঘন নীল রং-এর মাটি। ছোট ছোট হলদে উদ্ভিদ গজিয়েছে সেখানে। এখানে ওখানে বড় বড় রাক্ষুসে খাদ, অজস্র নুড়ি আর পাথর। মাঝে মাঝে নানান ধাতুর খোলা খনি। মাঝে মাঝে ট্যাঙ্ক-ট্যাক্সি থামিয়ে নুড়ি, পাথর আর খনিজদ্রব্য পরীক্ষা করে দেখছিল ধাতু-বিজ্ঞানী, তাকে সাহায্য করছিল মহাকাশ পদার্থবিদ্ টিম্বালটিয়া। প্ল্যাটিনাম আর ইউরেনিয়ামের অফুরন্ত ভাণ্ডার ছড়িয়ে ছিল চারপাশে। কোবাল্ট্, তামা আর আয়রন ওরেরও কমতি নেই। আরও হাজার মাইল দূরে সোনার সন্ধান পেল তারা।

সব রকমের ধাতুর নমুনা সংগ্রহ করে ট্যাঙ্ক-ট্যাক্সিতে তুলল জা-রো, তারপর একটু ঘুর পথে ফিরবার সময়ে একটা অতলস্পর্শী খাদের কিনারায় অজানা ধাতুর সন্ধান পেল সে। পরীক্ষা করেই জা-রো বুঝতে পারল যে এ ধাতু সৌরজগতের কোথাও পাওয়া যায় না। উত্তেজিত হয়ে উঠল জা-রো ও টিম্বালটিয়া। টকটকে লাল রং-এর এই ধাতুর বেশ কিছুটা নমুনা ট্যাঙ্ক-ট্যাক্সিতে তুলল তারা। মহাকাশযানে ফিরে গিয়ে তার ফিজিক্যাল ও কেমিক্যাল টেস্ট করতে হবে, জানতে হবে তার গুণাগুণ।

চু-গা আর জোম্বালজিয়া গিয়েছিল অন্য দিকে। এটা পাহাড়ি অঞ্চল। পাহাড়ের পাদদেশে অজানা লতা-গুল্ম, বিচিত্র বর্ণের ফুল ফুটে আছে, কিন্তু কোনো পতঙ্গ উড়ছে না তাদের ওপর। খুব কাছে এসে মন দিয়ে

দেখল চু-গা, লক্ষ্য করল যে পাপড়িগুলি ক্রমাগত বন্ধ হচ্ছে আর খুলছে। আরও দূরে উঁচু উঁচু পাহাড়ের মাথায় জমাট এ্যামোনিয়ার বরফে রক্ত-সূর্যের হলদে আলো পড়ে অপূর্ব সৌন্দর্যলোকের সৃষ্টি করেছিল। শব্দহীন বিশাল নিঃসঙ্গতার মাঝেও যেন এক গৌরব মহিমা। চু-গার হাত চেপে ধরে গভীর উষ্ণ কণ্ঠে জোম্বালজিয়া বলল,—'এই অপরূপ সৌন্দর্যলোকে অনন্তকাল ধরে বসে থাকলেও তা পুরোনো লাগবে না, তাই না চু-গা ?

তাকে আরও কাছে টেনে এনে বৃহস্পতির জীব-বিজ্ঞানী চু-গা বলল,—'হ্যাঁ জোম্বালজিয়া, আমাদের প্রেমের মতোই অক্ষয় আর শাশ্বত এই সৌন্দর্য ছবি।'

আর কোনো কথা বলতে পারেনি বুধকুমারী জোম্বালজিয়া। মন ভরে উঠেছিল তার এক অনির্বচনীয় তৃপ্তিতে। পারস্পরিক সান্নিধ্যের উষ্ণতায় মগ্ন হয়ে গিয়েছিল ওরা দু'জন।

একটু পরে চু-গা বলল,—'সবাই তো সমতলের দিকেই গেছে, চলো আমরা পাহাড়ে উঠি।'

'বেশ তো চলো,'—ব'লে আবার তাদের ট্যাঙ্ক-ট্যাক্সিতে উঠে বসল সে।

টিকটিকিরা যেভাবে খাড়া দেয়ালের গা বেয়ে ওপরে ওঠে ঠিক তেমনি-ভাবে খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে গাছ বাঁচিয়ে ওপরে উঠতে লাগল তারা। চু-গা বলল,—'উদ্ভিদ যখন আছে তখন এই তারায় প্রাণী কেন নেই বুঝতে পারছি না।'

'আছে নিশ্চয়ই—' আশাবাদী জোম্বালজিয়া বলল,—আমরা এখনো খুঁজে পাইনি তাদের।'

পাহাড়ের মাথায় উঠে অদ্ভুত এক ধরনের পাথর দেখতে পেল চু-গা। পাথরগুলো ক্রিকেট বলের মতোই বড় আর গোল, অঙ্গে তার হীরকের দীপ্তি, দীপ্তিটা ঘোর নীল রং-এর। বেশ কিছু পাথর ট্যাঙ্ক-ট্যাক্সিতে তুলে নিল চু-গা। ওরই মধ্যে যেটি উজ্জ্বলতম, সেটি তুলে জোম্বালজিয়ার হাতে তুলে দিয়ে বলল,—'চু-গার প্রণয় উপহার—'

আবেগে চু-গাকে ঘন করে জড়িয়ে ধরল জোম্বালজিয়া, ফিসফিস করে বলল,—'এসো, হলদে তারার পর্বত শিখরে বিয়ে করি আমরা।'

সেই স্তব্ধ নির্জন পর্বত শিখরে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের ভেতরে একটি আন্তর্গ্রহ বিয়ে হয়ে গেল। অডিয়স্কোপ মারফৎ সংবাদ পেয়ে ব্যোমব্রহ্মও খবরটা পাঠিয়ে দিল গ্রহমণ্ডলে সরকারের রাজধানীতে।

বি-মা আর সং-লা খুবই মুষড়ে পড়েছিল। এ কি রকম দেশ—নেই কোনো গ্রাম বা শহর, কলকারখানা বা কৃষিক্ষেত্র, ইস্কুল কলেজ, গবেষণাগার। আছে শুধু ধু-ধু প্রান্তর। কয়েকটা নদীও পার হতে হয়েছে তাদের। মাইল দুই তিন চওড়া নদী। ট্যাঙ্ক-ট্যাক্সি সেখানে লঞ্চ হয়ে চলছিল। জলের নীচে দেখা যায় এমন যন্ত্র চোখে লাগিয়েও কোনো মাছ বা জলচর প্রাণী দেখতে পায়নি তারা। এখানে ওখানে কয়েক ধরনের শৈবাল অবশ্য চোখে পড়েছিল। সাত আট হাজার মাইল ঘুরে শেষটায় হাল ছেড়ে দিয়ে নানান জায়গার মাটির নমুনা নিয়ে ওরা ফিরে এলো মহাকাশযানে।

প্রথম বারের বিফল অভিযানের শেষে খাবার টেবিলে বসে নানা আলোচনা হচ্ছিল অভিযাত্রীদের মধ্যে। হলদে তারা মার্কোসাপলাসে যদি কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী থাকেই তাহলে তাদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না কেন? তবে কি তারা কোনো প্রাণীঅনধ্যুষিত মরুপ্রান্তে নেমে পড়েছে?

বহু তর্ক-বিতর্কের পরেও সমস্যাটার কোনো সমাধান হল না। মহাকাশযানটিকে তুলে আবার এই তারার অন্য কোথাও নামানো কঠিন ব্যাপার, তাছাড়া এর আগেই একটি বড় তারার আকর্ষণ বন্ধন ছিন্ন করবার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে আণবিক জ্বালানী খরচ হয়ে গেছে। এখন যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা স্পেস-স্টেশন ৭২০ তে ফিরে যাবার জন্য যথেষ্ট হলেও, অকারণে তা থেকে আর খরচ

করা ঠিক নয়। ব্যোমব্রহ্ম বলল,—'তোমরা যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিলে, আমি তখন গ্রহমণ্ডল সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করছিলাম।'

জোম্বালজিয়া চার চোখ তুলে তাকালো, বলল,—'সফল হয়েছেন ?'

'নিশ্চয়ই। আমাদের সফল অবতরণের কথা জানিয়ে দিয়েছি—তোমাদের বিয়ের কথাটাও,—এতক্ষণে সেটা খবর হয়ে গ্রহে গ্রহে ছড়িয়ে পড়েছে—'

'বিয়ে ?' অবাক হয়ে টিম্বালটিয়া বলল,—'কার ?'

'আহা, কিছুই যেন জানো না ? চু-গা আর জোম্বালজিয়ার।'

হৈ-হৈ পড়ে গেল। সবাই উঠে নব দম্পতীকে অভিনন্দন জানালো। পুরো এক জাগ ট্রুয়াম খরচা হয়ে গেল।

উচ্ছ্বাসের পালা শেষ হলে পর ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে টিম্বালটিয়া বলল,—'কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আসা হয়েছে তাই যদি সফল না হয় তাহলে যে কোটি কোটি টাকার এই বিরাট অভিযানের কোনো সার্থকতাই থাকবে না স্পেস-কম্যাণ্ডার ?'

'আহা, অল্পেই এত মুষড়ে পড়লে কেন টিম্বালটিয়া ? বিশাল তারা এটা, পৃথিবীর দেড়শ' গুণ, তার কতটুকু অংশই বা দেখেছ আজ ?'

'ঠিক বলেছেন স্পেস্-কম্যাণ্ডার,—' বলে উঠলো জা-রো,—'আরও দূরে দূরে অভিযান চালাতে হবে আমাদের, এই তারায় প্রতি মাইল অংশ তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সেজন্য যদি এখানে ছয় মাসও থাকতে হয় তা-ও ভালো। সফল হলে মহাকাশ বিজয়ের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবো আমরা।

উঠে দাঁড়িয়ে জা-রো-র কথা সমর্থন করল সবাই। সবার মন থেকে হতাশা কেটে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে, আবার সবাই উৎসাহ আর উদ্দীপনায় টইটম্বুর হয়ে উঠলো।

ব্যোমব্রহ্ম বলল,—'বেশ, এবার তাহলে খাওয়া-দাওয়া সেরে চটপট শুয়ে পড়া যাক। মার্কোসাপলাসের দেড় "জি" মাধ্যাকর্ষণ সহজেই

ক্লান্ত করে তুলছে আমাদের। কাল থেকে কাজে বেরুবার আগে একটা ক'রে এনার্জি বড়ি খেয়ে নিও সবাই।'

কিছুক্ষণ পরেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল সবাই। শুধু রবট দুটি আর কমপিউটারটি সতর্ক চক্ষু মেলে মহাকাশযানটিকে পাহারা দিতে লাগল।

পৃথিবীর সময়ের হিসেবে চার মাস কেটে গেল। মার্কোসাপলাসের আলোকিত পৃষ্ঠের সর্বত্র আঁতিপাঁতি ক'রে অনুসন্ধানের কাজ চালালো অভিযাত্রীরা। দশ মাইল গভীর খাদের ভেতরে নেমে দেখল, পাঁচশ মাইল উঁচু পাহাড়ের মাথায় উঠে দেখল, সমুদ্র আর নদীর গভীরে নেমে দেখল, কিন্তু কোথাও কোনো প্রাণীর সন্ধান পেল না। সেই অদ্ভুত সঙ্কেতটাও শোনা যাচ্ছিল না আর।

ব্যাপারটা পরম আশাবাদী ব্যোমব্রহ্মকেও ভাবিয়ে তুলল। সে স্পেস-শিপ ছেড়ে দূরে কোথাও যায়নি বটে, তবু সেখানে থেকেই এক অদ্ভুত পরীক্ষা করল সে। পৃথিবী থেকে যব, গম, ধান আর ছোলার বীজ নিয়ে এসেছিল সে। মহাকাশযানের কাছেই একটা জায়গা বেশ ভালো করে খুঁড়ে জমি তৈরী করে সেই বীজ ফেলেছিল ব্যোমব্রহ্ম। পৃথিবীর তুলনায় অনেক আগেই তাতে অঙ্কুরোদ্গম হল, সতেজ সুপুষ্ট চারা গাছ খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠলো। গ্রহমণ্ডল সরকারের কাছে রিপোর্ট পাঠালো ব্যোমব্রহ্ম : 'যদি কখনও গ্রহমণ্ডলে জনসংখ্যার পরিমাণ বিপজ্জনকভাবে বেড়ে ওঠে, তাহলে অতিকায় মহাকাশ ট্রেনে করে বহু কোটি প্রাণীকে এই হলদে তারায় স্থানান্তরিত করতে পারেন। এই তারা শস্যশালিনী হবার উপযুক্ত, জমি অত্যন্ত উর্বর।

জা-রো আর টিম্বালটিয়ার যৌথ অভিযানগুলিও অন্যভাবে সফল হল। মার্কোসাপলাসের উষর প্রান্তর থেকে তিন রকমের অজানা মৌলিক ধাতু আবিষ্কার করল তারা। মহাকাশযানের ল্যাবরেটরীতে সেগুলো নিয়ে নানারকমের পরীক্ষা চালালো টিম্বালটিয়া। তাদের নতুন নাম হ'ল মার্কো—১, মার্কো—২ আর মার্কো—৩।

তিনটি মৌলিক ধাতুই অসাধারণ, সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহে ১০৯টি মৌলিক ধাতুর সঙ্গে কোনো মিলই নেই তাদের। মার্কো—১ গ্যাসীয় পদার্থ, হাইড্রোজেনের মতো দাহ্য কিন্তু জলের চেয়ে ভারী। যেখানে তরল হাইড্রোজেনের বয়েলিং পয়েন্ট মাইনাস ২৫২·৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্, সেখানে তরল মার্কো—১-এর বয়েলিং পয়েন্ট মাত্র মাইনাস ৭৮ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্। থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি হাইড্রোজেনের চার ভাগের এক ভাগ এবং পদার্থটি অক্সিজেনের মতোই বহু ধাতুর সঙ্গে যৌগ সৃষ্টি করে। মার্কো—২ আর মার্কো—৩ অবশ্য কঠিন পদার্থ। ওরা তাপ সঞ্চালক হলেও বিদ্যুৎ সঞ্চালক নয়। স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি যথাক্রমে ৫০·৩ এবং ৩৬·৭। মেলটিং পয়েন্ট ২৫৭০ ডিগ্রী ও ২৭৭২ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্। এ্যাটমিক ওয়েট ২৯৩ ও ৩৭৭·৩। বৈদ্যুতিক চুল্লীতে ওদের গালিয়ে ফেলার পরে দেখা গেল যে ওরা গামা-রে বিকিরণ করে।

প্রথম দিনের অভিযান থেকে চু-গা যে ক্রিকেট বলের মতো বড়ো আর গোল পাথর এসেছিল তা নিয়েও নানান পরীক্ষা চালাল সং-লা। দেখা গেল যে এ পদার্থটির সঙ্গেও পৃথিবী বা সৌরজগতের কোনোরকম মিল নেই। এ-ও এক অনন্য পাথর যার দীপ্তি হীরের মতো, কাঠিন্য কাচের মতো, যা নাইট্রিক, সালফিউরিক বা হাইড্রোক্লোরিক এ্যাসিডেও গলে না। এ ধরনের পাথর 'চু-গা উপত্যকায়,' হাজার হাজার।

এসব উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার গ্রহমণ্ডলের বিজ্ঞানীদের মনে গভীর ঔৎসুক্য জন্মালেও যে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বিপুল মহাকাশে কোটি কোটি মাইল পথ অতিক্রম করে এতদূর আসা, সেই আসল কাজটি সফল না হওয়ার ফলে অভিযাত্রীরা ক্রমশ বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল। এমনকি চু-গা আর জোম্বালজিয়ার নব অনুরাগও তাদের মনে হতাশাকে চাপা দিতে পারছিল না। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে সৌরজগতের প্রাণীরা যে একেবারে নিঃসঙ্গ নয়, কোথাও না কোথাও যে জীবনের অস্তিত্ব আছে, কোনো কোনো গ্রহ বা তারাতে যে বুদ্ধিমান প্রাণীর

আবির্ভাব ঘটেছে, নতুন ধরনের সভ্যতা গড়ে উঠেছে এটা ছিল গ্রহমণ্ডলের বিজ্ঞানীদের বহুপোষিত স্বপ্ন। সেই স্বপ্নটা কি সাফল্যের দুয়ারে এসে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে।

সেদিন কেউ আর অভিযানে বার হয়নি। মহাকাশযানের লাইব্রেরীতে বসে তাদের অভিযানের বিফলতা নিয়ে আলোচনা করছিল সবাই। হঠাৎ ব্যোমব্রহ্ম বলে উঠলো,—'মার্কোসাপলাসের আলোকিত অংশে এ দেশের কোনো প্রাণী খুঁজে না পাবার কারণ আমি খুঁজে পেয়েছি—'

সবাই চকিত হয়ে নড়েচড়ে বসল। দেড় "জি"র ওজনটা এতদিনে বেশ রপ্ত হয়ে গিয়েছিল বলে নড়াচড়া করতে আগের মতো অত কষ্ট হচ্ছিল না ওদের। টিম্বালটিয়ার কৌতূহলই বুঝি সবার চাইতে বেশী, প্রশ্ন করল সে,—'কি কারণ স্পেস-কম্যাণ্ডার ?'

'তার আগে বি-মা-র গতকালের অভিযানের কাহিনীটা আর একবার শোনো সবাই। বলো বি-মা।'

বি-মা উঠে দাঁড়াল, বক্তৃতা দেবার পোজ নিল, তারপর বলল,—'এই অভিযানে আমার সঙ্গী ছিল সং-লা। আমরা যে জায়গাটাতে নেমেছি সে জায়গাটা হ'ল মার্কোসাপলাসের মরুভূমি। মাটি অত্যন্ত উর্বর বলে এই মরু অঞ্চলেও উদ্ভিদ জন্মায়, ফুল ফোটে, পাহাড়ের কোলে দীর্ঘ পত্র গাছ দেখা যায়। এই চারমাসে এখানে বৃষ্টিপাত হয়েছে মাত্র দু'শ মিলিমিটার। আমি আর সং-লা তাই ঠিক করলাম যে মার্কোসাপলাসের যেসব অঞ্চলে ঘন ঘন ও প্রচুর বৃষ্টি হয়, আমরা সেই অঞ্চলে গিয়ে পর্যবেক্ষণ চালাব। কুড়ি দিনের খাবার বেঁধে নিয়ে ট্যাঙ্ক-ট্যাক্সিতে চেপে রওনা হয়ে গেলাম। অবশ্য যত-দূরেই যাই না কেন, অডিওস্কোপে স্পেস-কম্যাণ্ডারের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। তাই না স্পেস-কম্যাণ্ডার ?'

সংক্ষিপ্তভাবে ব্যোমব্রহ্ম বলল,—'হ্যাঁ।'

'এখান থেকে আশী হাজার মাইল দূরে আমাদের ঈপ্সিত অঞ্চলের

দেখা পেলাম। বৃষ্টিপাত এখানে প্রচুর, পাহাড়ও বেশী নেই, হাজার হাজার মাইল জুড়ে সে এক গভীর অরণ্য। সেই অরণ্যের সবচেয়ে বেঁটে গাছ যেটি সেটিও লম্বায় আধ মাইলের কম হবে না, তার গুঁড়ির বেড় পাঁচশ ফুট। নানারকমের ফল ফলে আছে, তার অধিকাংশই সুস্বাদু। এ্যানালিসিস করে দেখা গেছে যে রসালো। ফলগুলি প্রোটিন সমৃদ্ধ এবং তিন জাতের অজানা ভিটামিনে ভরপুর।'

ওদের আনা ফল অভিযাত্রীরা সবাই খেয়ে দেখেছে, তাই বি-মা-র সমর্থকের অভাব হ'ল না।

সবাই লক্ষ্য করল যে বি-মা-র কথা শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে ব্যোমব্রহ্ম, আপন মনে কি যেন ভাবছে সে! শেষটায় কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে জোম্বালজিয়া বলে উঠল,—'এত কী ভাবছেন স্পেস্-কম্যাণ্ডার?'

যেন চমক ভাঙলো ব্যোমব্রহ্মার, দেখল সবাই তারই মুখে তাকিয়ে আছে, আস্তে আস্তে বলল,—'আমি এই তুয়ের মধ্যে একটা যোগসূত্র দেখতে পাচ্ছি জোম্বালজিয়া।'

'এই তুয়ের মধ্যে? তার মানে?'

'মানে এই হলদে তারার প্রাণী-শূন্য হয়ে যাওয়া আর লতা-গুল্ম উদ্ভিদ বনস্পতিতে সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠে। একটু অস্বাভাবিক ব্যাপার, তাই না?'

কথাটা সবার মনেই উঁকিঝুঁকি মারছিল, তাই ব্যোমব্রহ্মার কথার প্রতিবাদ করল না কেউ।

ব্যোমব্রহ্ম বলতে লাগল,—'আমরা জানি সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহে প্রাণী সৃষ্টির অনেক আগে উদ্ভিদেরা জন্ম নিয়েছে। বহু কোটি বছর ধরে ক্রম-বিবর্তনের ফলে পরে প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে। এখানেও তার ব্যতিক্রম হবার কথা নয়, আর যদি ব্যতিক্রম হয়েও থাকে তাহলে ধারাটাই উল্টে গেছে, অর্থাৎ আগে প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে, পরে এসেছে উদ্ভিদ। এখানকার উদ্ভিদের প্রাণশক্তি অসাধারণ, পৃথিবীর চেয়ে অন্ততঃ একশ' গুণ বেশী। অথচ এখানকার মাটিতে উদ্ভিদের যা খাদ্য,

সেই নাইট্রোজেন, পটাশ আর ফসফেটের পরিমাণ পৃথিবীর চেয়ে মাত্র দুই গুণ বেশী। তাহলে এই অতিরিক্ত প্রাণশক্তি আসছে কোথা থেকে ?'

সং-লাই এখানকার মাটির রাসায়নিক পরীক্ষা করেছিল মহাকাশ-যানের ল্যাবরেটরীতে, মাটিতে সার সংক্রান্ত তথ্যের সমর্থন জানালো সে, বলল,—'কথাটা আমার মনেও উঠছিল, বিশেষ করে ধান গম যব আর ছোলার অস্বাভাবিক বেড়ে ওঠা দেখে। চারাগুলো পৃথিবীর চারার দ্বিগুণ হলে কিছু বলবার ছিল না, কিন্তু হয়ে উঠেছে প্রায় দশগুণ।'

বোমব্রহ্ম বলল,—'এর একটাই কারণ থাকতে পারে—'

জা-রো বলল,—'কি কারণ স্পেস-কম্যাণ্ডার ?'

'হলদে তারার বায়ুমণ্ডলে এক ধরনের অজ্ঞাত রশ্মি বিকিরণ হয়। প্রাণীজগতে আর উদ্ভিদজগতে বিপরীত প্রভাব তার। ঐ অজ্ঞাত রশ্মি প্রাণীর জীবকোষ ধ্বংস করে ফেলে, তাই মার্কোসাপলাসের আলোকিত অংশে কোনো প্রাণীর সন্ধান পাইনি আমরা। সেই অজ্ঞাত রশ্মিই আবার উদ্ভিদের দেহকোষে আশ্চর্যজনক পুষ্টি সঞ্চার করে, যার ফলেই এখানকার উদ্ভিদজগতের এত বাড় বাড়ন্ত।'

কথাটা পরিপাক করবার জন্য বেশ কিছুটা সময় নিল সবাই। একটু পরে চু-গা বলে উঠল,—'ঠিক ঠিক, হয়তো মারাত্মক রশ্মির আঘাতে সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস আর ক্রোমোজোম—যা কিছুই প্রাণের আধার, সবই ধ্বংস হয়ে যায়।'

টিম্বালটিয়া বিজ্ঞানী, অনুমানের ওপরে তার আস্থা কম, সে বলল,—'উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ছাড়া শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করে এতবড় একটা সিদ্ধান্তে আসা ঠিক হবে না স্পেস-কম্যাণ্ডার।'

'নিশ্চয়ই হবে না,—' জোর গলায় বলে উঠলো ব্যোমব্রহ্ম—'চমৎকার ল্যাবেরেটারী আছে এখানে, ইচ্ছে মতো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করো। তবে এ-ও বলে রাখছি টিম্বালটিয়া, আমার অনুমানই ঠিক হবে। অমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ঐ রক্ত-সূর্য থেকে এক ধরনের মারাত্মক

মহাজাগতিক রশ্মি এই হলদে তারার আলোকিত অংশে পড়ছে আমাদের কমপিউটার বলছে যে এই হলদে তারার চারপাশের অকাশে পৃথিবীর মতো কোনো রক্ষাকারী বিকিরণ বলয় নেই,* তাই হয়তো ঐ রশ্মির পক্ষে এই হলদে তারাটা একেবারে অবারিত দ্বার।'

টিম্বালটিয়া বলল,—'হয়তো আপনার অনুমান ঠিক স্পেস-কম্যাণ্ডার, তবু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার নিকষে তাকে ঘষে দেখা দরকার।'

'বেশ তো কাল থেকেই কাজে লেগে যাও তুমি।'

পরদিনই কাজে লেগে গেল টিম্বালটিয়া। ল্যাবোরেটরীর স্পেকট্রো অ্যানালাইজার যন্ত্রটির ভেতর দিয়ে হলদে রোদ ঢোকালো সে। ঐ চেইনে আরও ছয়টা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র কাজ শুরু করে দিল। রক্তসূর্যের হলদে আলো বিশ্লিষ্ট হতে হতে হঠাৎ এক সময়ে এক অজ্ঞাত রশ্মির অস্তিত্ব ধরা পড়ল। অভিযাত্রী-বিজ্ঞানীরা কাছেই বসে পরীক্ষার কাজ দেখছিল, তারা হর্ষধ্বনি করে উঠলো। ব্যোমব্রহ্ম লাইব্রেরীতে বসে একটি ইতিহাসের বই পড়ছিল, সে ছুটে এলো ঐ শব্দ শুনে। তাকে দেখামাত্র উত্তেজিত ভাবে টিম্বালটিয়া বলল,—'আপনার অনুমান নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে স্পেস-কম্যাণ্ডার। রক্ত-সূর্যের আলোয় এক ধরনের অজ্ঞাত রশ্মির সন্ধান পাওয়া গেছে।'

'অজ্ঞাতকে জ্ঞাত করা যায় না টিম্বালটিয়া ?'

'না স্পেস-কম্যাণ্ডার। এ ধরনের রশ্মি বিকিরণ সৌরমণ্ডলে হয় না। দূর মহাকাশের কোথাও আমরা এই রশ্মির সন্ধান এতদিন পাইনি, তাই তার স্বরূপ উদ্ঘাটনে বর্তমান যন্ত্রগুলি অক্ষম। গবেষণা করে এই রশ্মি বিশ্লেষণের যন্ত্র হয়তো উদ্ভাবন করা যায়, কিন্তু তা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।'

---

* ভ্যান এ্যালেন বেল্টের মতো

টিম্বালটিয়ার যুক্তিপূর্ণ কথাগুলো সমর্থন করল জা-রো আর বি-মা।
চু-গা বলল,—'কিন্তু এই রশ্মি যে প্রাণ ধ্বংস করে তার প্রমাণ কোথায় টিম্বালটিয়া ?'
'তার প্রমাণ পাওয়া তো খুবই সহজ চু-গা। এর জন্য চাই মাত্র এক ফোঁটা রক্ত—'
সব অভিযাত্রী-বিজ্ঞানীরাই রক্ত দেবার জন্য এগিয়ে এলো, কিন্তু টিম্বালটিয়া বলল,—'না, এ গৌরব একমাত্র স্পেস-কম্যাণ্ডারেরই প্রাপ্য। এ আইডিয়াটা তাঁরই।'
কেউ কোনো আপত্তি করল না। বিশেষ স্লাইডের ওপর ব্যোমব্রহ্মার আঙ্গুল থেকে এক ফোঁটা রক্ত নেওয়া হ'ল। ইলেক্ট্রনিক মাইক্রো-স্কোপে স্লাইডটা এক পলক দেখে নিয়ে টিম্বালটিয়া বলল,—'রক্তের ফোঁটাতে আপনার প্রাণসত্তা ঝলমল করছে স্পেস-কম্যাণ্ডার, এইবার এই স্পেকট্রো-এ্যানালাইজারের গর্ভ থেকে এক ঝলক বিশ্লেষিত অজ্ঞাত রশ্মি ফেলছি এর ওপর।'
সবাই পলকহীন চোখে টিম্বালটিয়ার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দেখতে লাগল, এক মুহূর্ত পরেই আর্তনাদ করে উঠলো টিম্বালটিয়া—'একি ? চোখের পলকে রক্তের জীবন্ত কোষগুলো মারা গেল, যেভাবে ক্যান্সারে দেহকোষ ধ্বংস হয় ঠিক তেমনিভাবে, তবে আরও দ্রুত, আরও নিশ্চিত, হয়তো বা নিষ্ঠুরও।'
অন্যসব বিজ্ঞানীরাও পালা করে ইলেকট্রনিক মাইক্রোস্কোপে ঝুঁকে পড়ল, অবাক হয়ে দেখল যে টিম্বালটিয়ার কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে সত্যি ! স্তব্ধ হয়ে বসে রইলে সবাই।
সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করে ব্যোমব্রহ্ম বলল,—'বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় আমার একটি অনুমান নির্ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই মনে হয় যে আমার দ্বিতীয় অনুমান, অর্থাৎ এই অজ্ঞাত রশ্মির প্রভাবে গাছপালার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির অনুমানটাও ঠিকই হবে। উদ্ভিদের পক্ষে হিতকারী হ'লেও জীবকোষ ধ্বংসকারী এই অজ্ঞাত রশ্মির নাম দেওয়া যাক "মৃত্যুরশ্মি"।'

বিজ্ঞানীরা একবাক্যে এই নতুন নামকরণে সায় দিল।

ব্যোমব্রহ্ম বলেই চলল,—মার্কোসাপলাস নামে তারাটির অক্ষদণ্ড রক্ত-সূর্যের প্লেনের সঙ্গে এক ডিগ্রী কোণ রচনা করে অবিরাম ঘুরপাক খাচ্ছে। ফলে আমরা রক্ত-সূর্যের উদয়-অস্ত দেখতে পারছি না। দূর আকাশে রক্ত-সূর্য একটা ছোট্ট বৃত্তের চারদিকে ঘুরছে, শুধু এটুকুই দেখতে পাচ্ছি। মার্কেসাপলাসের আয়তনের অর্ধেক অংশে সব সময়েই দিন, বাকী অর্ধেক অংশে সব সময়েই রাত। রাত আর দিনের সীমা-রেখায় চির গোধূলি, যেখানে রক্ত-সূর্যের রশ্মি তির্যকভাবে পড়েছে।'

ব্যোমব্রহ্ম যতক্ষণ কথা বলছিল, ততক্ষণ টিম্বালটিয়া নানান ধরনের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে মৃত্যুরশ্মি নিয়ে আরও পরীক্ষা করছিল, এবারে সে মুখ তুলে বলল,—'জানেন স্পেস-কম্যাণ্ডার, এই মৃত্যুরশ্মি কিন্তু গামা-রশ্মির চেয়ে এক লক্ষ গুণ বেশী শক্তিশালী।'

শিউরে উঠে জোম্বালজিয়া বলল,—'কি সাংঘাতিক ? আমরা তাহলে এখেনো বেঁচে আছি কি করে স্পেস-কম্যাণ্ডার ?'

'তোমরা যে বিশেষ ধরনের স্পেস-স্যুট পরে বাইরে যাও জোম্বালজিয়া, ঐ স্পেস-স্যুইট মৃত্যুরশ্মির আক্রমণ থেকে রক্ষা করছে তোমাদের দেহকোষকে। আর আমাদের মহাকাশযানের বাইরের দিকে এক ধরনের বিশেষ আবরণ লাগানো আছে, যে কোনো ধরনের মহা-জাগতিক রশ্মিকে প্রতিহত করবার ক্ষমতা আছে তার।'

এ্যাসট্রো-কেমিস্ট সং-লা বলল,—'ঠিক বলেছেন স্পেস-কম্যাণ্ডার। প্রথম দিনেই বাইরে যাবার সময়ে আমাদের ঐ বিশেষ ধরনের স্পেস-স্যুট পরতে বাধ্য করেছিলেন বলেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি আমরা।'

চু-গা বলল,—'কিন্তু সৌরজগতের অজানা মৃত্যুরশ্মির উদ্ভব হলো কি করে ?'

সং-লা বলল,—মার্কোসাপলাসে আমরা অন্ততপক্ষে তিন রকমের মৌলিক ধাতুর সন্ধান পেয়েছি, যা সৌরজগতে নেই। ঐ রক্ত-সূর্যেও এই ধরনের অজানা মৌলিক ধাতু থাকা সম্ভব। হয়তো রক্ত-সূর্যের

অভ্যন্তরে ঐসব অজানা ধাতুর পারমাণবিক ভাঙন চলছে যার ফলে মৃত্যুরশ্মির 'কণিকাগুলি মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ছে।'

ব্যোমব্রহ্ম কী যেন ভাবছিল, বলে উঠল—'টিম্বালটিয়া—'

'কি বলছেন স্পেস-কম্যাণ্ডার ?'

'রক্ত-সূর্যের আলো থেকে ঐ মৃত্যুরশ্মি বিশ্লিষ্ট করে সংগ্রহ করে রাখা যায় ?'

'কেন যাবে না ?' কিন্তু 'কী ফল হবে তাতে ?

'নিয়ে যাবো পৃথিবীতে ডক্টর গুণবর্ধনের কাছে, এ নিয়ে আরও গবেষণা করবার জন্য।'

'তা সংগ্রহ করা যাবে স্পেস-কম্যাণ্ডার। কতটা চাই ?'

'ধর পঞ্চাশ লাখ মিলি ওয়েভ।'

'বেশ, তাই হবে—'

সং-লা বলে উঠলো,—'সংগ্রহ যে করবে, রাখবে কোথায় ?'

'কেন, ডিসইন্টিগ্রেটিং রশ্মির খালি খোলে ? ওগুলো তো বিশেষভাবে তৈরী বিশেষ বিকিরণ নিরোধক আধার—'

'খুব ভালো ব্যবস্থা—' অনুমোদনের সুরে ব্যোমব্রহ্ম বলল,—'তুমি এখন থেকেই কাজে লেগে যাও।'

একটা কাজের মতো কাজ হাতে পেয়ে উৎসাহের সঙ্গে কাজে লেগে গেল এ্যাসট্রো-ফিজিসিস্ট্ টিম্বালটিয়া।

এতক্ষণ একেবারে নির্বাক ছিল জা-স্লো, এবারে মুখ খুলল সে, বলল,—'আমার অনুমানটাও ঠিক হয়েছে স্পেস-কম্যাণ্ডার ?'

ভুরু কুঁচকে ব্যোমব্রহ্ম বলল,—'তোমার কোন্ অনুমানের কথা বলছ জা-স্লো ?'

বিজয়গর্বে জা-স্লো বলল,—'আমি বলেছিলাম না, যে কমপিউটেশনের ত্রুটির ফলে ভুল তারাতে নেমে পড়েছি আমরা। কারণ মৃত্যুরশ্মির অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিলে তো এই হলদে তারায় প্রাণীর অস্তিত্বের কথা কল্পনাও করা যায় না। আর যদি থাকতোও, তাহলে কি আর এই দীর্ঘ চার মাসের মধ্যেও তাদের দেখা পেতাম না ?'

ব্যোমব্রহ্মের মুখেচোখে চিন্তার রেখা দেখা দিল, জা-রোর যুক্তিকে অস্বীকার করতে পারল না।

অন্য অভিযাত্রীরাও কী বলবে ভেবে পেল না। শেষ পর্যন্ত কি কমপিউ-টারের ভুল নির্দেশের জন্যই তাদের এত বড় অভিযানটা ব্যর্থ হয়ে যাবে? গ্রহমণ্ডল সরকারের কাছে কী কৈফিয়ৎ দেবে তারা?

মহাকাশযানের ল্যাবরেটরীর ভেতরে নেমে এলো এক অস্বস্তিকর নীরবতা। হঠাৎ সেই নীরবতা ভঙ্গ করে কনট্রোল প্যানেলের এলার্ম বেল বেজে উঠল। দেড়া ওজন নিয়ে সেখানে ছুটে গেল স্পেস-কম্যাণ্ডার ব্যোমব্রহ্ম। তার পেছনে পেছনে ছুটে গেল ছয়জন অভিযাত্রী।

কনট্রোল বোর্ডের স্টেরিওগ্রাফ্ যন্ত্রটি তখন মুখর হয়ে উঠেছিল, টেপে জোরালো সঙ্কেত রেকর্ড করছিল। কনট্রোল রুমটি ভরে উঠেছিল সঙ্কেত ধ্বনিতে।

হাততালি দিয়ে ব'লে উঠলো টিম্বালটিয়া,—'এ কি? স্পেস-কম্যাণ্ডার, শুনেছেন? এ যে সেই সঙ্কেত, যা শুনে এতদূরে ছুটে এসেছি আমরা। এই তো সেই পিয়ের লোটি সঙ্কেত?'

উত্তেজিতভাবে বি-মা বলল,—'ঠিক বলেছ টিম্বালটিয়া। মার্কোসা-পলানরা আবার সঙ্কেত পাঠাচ্ছে আমাদের—'

এক পাক নেচে চু-গা বলল, 'নিশ্চয়ই ডাকছে আমাদের?'

ধীর স্থির ব্যোমব্রহ্ম কনট্রোল বোর্ডের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিল, বোর্ডের লাল, নীল, সবুজ, হলদে আলো তার মুখের ওপর পড়েছিল, অজানা তারার বিচিত্র জীব বলে মনে হচ্ছিল তাকে। কিন্তু এসব দিকে বিন্দু-মাত্রও মনোযোগ ছিল না ব্যোমব্রহ্মার। তার সমস্ত মন তখন হয়েছিল স্পট-ফাইণ্ডার মেশিনের ডায়ালের ওপর। ঐ মেশিনটা তখন কেন্দ্রীভূত শব্দ তরঙ্গের গতি অনুসরণ করে সঙ্কেতের উৎস নির্ণয় করবার চেষ্টা করছিল।

সব উচ্ছ্বাস থামিয়ে চুপচাপ তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল ছয়জন অভিযাত্রী।

অনেকক্ষণ পরে সোজা হয়ে দাঁড়াল ব্যোমব্রহ্ম, তার দুই চোখ চকচক

করছিল, মুখখানা গভীর উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছিল। অভিযাত্রীরা উৎসুক চোখে তার মুখের দিকে তাকালো।

চীৎকার করে ব্যোমব্রহ্ম বলল—'ইস্, এ কথাটা আগে কেন মাথায় আসেনি! মার্কোসাপলাসের বুদ্ধিমান প্রাণী মার্কোসাপলানরা এই হলদে তারাতেই আছে।'

অসহিষ্ণু কণ্ঠে চু-গা বলল,—'সেটা তো এখন পরীক্ষিত সত্য স্পেস-কম্যাণ্ডার। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল কোথায় লুকিয়ে আছে তারা? আমরা তো এই চার মাস ধরে তারাটার সর্বত্র চষে বেড়িয়েছি—'

'উঁহুঃ, সর্বত্র নয়, সর্বত্র নয়।'

ভড়কে গিয়ে চু-গা বলল,—'সর্বত্র নয় মানে? আলবৎ সর্বত্র। আমাদের ডায়েরী দেখুন—'

চু-গার সাহায্যে এগিয়ে এলো সং-লা, খাপ্পা হয়ে উঠলো সে,—'কোনো জায়গা বাদ নেই স্পেস-কম্যাণ্ডার। আমি তারাটার একটা রিলিফ ম্যাপ পর্যন্ত তৈরী করেছি, তাতেই আমাদের পদার্পণ দেখানো আছে—'

দু'হাত তুলে ব্যোমব্রহ্ম বলল—'আপনারা অকারণে উত্তেজিত হবেন না, আগে আমার কথাটা শুনুন—'

'বেশ, বলুন, শুনছি।'

'আপনারা যে হলদে তারাটার আলোকিত অংশের সর্বত্র গেছেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আলোকিত অংশই তারাটার সবটুকু নয়—'

টিম্বালটিয়া বলল,—'আপনি বুঝি মার্কোসাপলাসের চির-অন্ধকার দিকটার কথা বলছেন স্পেস-কম্যাণ্ডার?'

'ঠিক তাই। এর অন্ধকার দিক সম্পর্কে সম্পূর্ণ অন্ধকারে আছি আমরা।'

চোখ ছোট করে চু-গা বলল,—'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন যে ঐ অন্ধকার অংশ থেকেই সঙ্কেত পাচ্ছি আমরা?'

ব্যোমব্রহ্ম কিছু বলল না, শুধু স্মিত মুখে তাকিয়ে রইলো।

কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে রইলো সবাই। তারপর আস্তে আস্তে বি-মা বলল,—'তাহলে আপনার এই ধারণা যে মার্কোসাপলাসের বুদ্ধিমান প্রাণীরা এই তারার চির-অন্ধকার দিকেই থাকে ?'

'শুধু ধারণাই নয় বি-মা, বাস্তব সত্য এটা। স্পট-ফাইণ্ডার মেশিনও এই কথাই বলছে আমাদের।'

জা-রো বলল,—'হ্যাঁ, এটা খুবই সম্ভব। মৃত্যুরশ্মির হাত এড়াতে অন্ধকারে চলে গেছে হলদে তারার বুদ্ধিমান প্রাণীরা।'

জীব-বিজ্ঞানী চু-গা ঘাড় নাড়ল, বলল, 'কিন্তু তা কি করে সম্ভব ?'

ব্যোমব্রহ্ম বলল,—'কেন, সম্ভব নয়ই বা কেন ?'

'সম্ভব নয় এইজন্য যে সূর্য কিরণই হ'ল উদ্ভিদ ও প্রাণী-জগতের বিকাশের প্রধান উপাদান এবং প্রাণশক্তির উৎস। কাজেই মার্কোসাপলাসের বুদ্ধিমান প্রাণীরা আলোর অভাবে বেঁচে থাকবে কি করে ? এ যে একেবারেই অসম্ভব।'

চু-গার কথা শুনে গভীর চোখে তার মুখে তাকালো জোম্বালজিয়া। এ্যাসট্রো-চিকিৎসক সে, চু-গার যুক্তিকে উড়িয়ে দিতে পারলো না। টিম্বালটিয়া তাকালো জা-রোর মুখে, বি-মা তাকালো ব্যোমব্রহ্মের মুখে।

ধীরে ধীরে ব্যোমব্রহ্ম বলল,—'আমরা সবাই সৌরজগতের প্রাণী, আলো ভালোবাসি আমরা, আলোকেই আমাদের জীবনের মূল বলে ভাবতে শিখেছি। কিন্তু এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের বহু রহস্যই এখনো অজ্ঞান আমাদের কাছে, আমাদের জানার পরিধির বাইরেও বহু ব্যাপার আছে, বহু ব্যাপার ঘটছে। এমনও তো হতে পারে যে সৌরজগতের সীমানার বাইরে এই গ্যালাক্সীর অন্য কোনো গ্রহ বা তারায় জীবনের এমন সব বিবর্তন ঘটেছে যার মূলে আলোর ভূমিকা একেবারেই নেই !'

ব্যোমব্রহ্মের জোরালো যুক্তি শুনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো অভিযাত্রী-বিজ্ঞানীরা, শেষটায় জীব-বিজ্ঞানী জা-রো বলল,—'ঠিক বলেছেন স্পেস-কম্যাণ্ডার। প্রকৃতির প্রতিকূলতা কাটাবার চেষ্টা করা

জীবনের একটি প্রধান লক্ষণ, তাতে কখনো প্রকৃতি জেতে, কখনো বা জীবন। আলো যেখানে মৃত্যু-স্বরূপ, সেখানে অন্ধকারেই জীবনের বিকাশ অসম্ভব নয়।'

টিম্বালটিয়াও সায় দিল জা-রোর কথায়,—'বিশেষ করে এই হলদে তারায়,—এখানকার আলোতে দেহকোষ ধ্বংসকারী মৃত্যুরশ্মি আছে, কাজেই জীবন তার নিজের নিয়মেই অন্ধকার খুঁজবে। আমার মনে হয় বহু কোটি বছর আগে মার্কোসাপলাসের প্রাণীদের একটি প্রজাতি এই তারার চির-অন্ধকার পিঠে গিয়ে আশ্রয় নেয়, এবং বিবর্তনের ফলে তারা আজ মহাবুদ্ধিমান প্রাণীতে রূপান্তরিত হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তির চরম বিকাশ দেখা দিয়েছে তাদের মধ্যে, তারা আজ সংকেত পাঠিয়ে সুদূর সৌরজগৎ থেকে আমাদের এখানে টেনে আনবার মতো ক্ষমতা অর্জন করেছে।'

টিম্বালটিয়ার কথা শুনে হৈ হৈ করে উঠলো সবাই। সং-লা বলল, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের স্পেস-কম্যাণ্ডার যুক্তিসঙ্গত অনুমানে বেশ দক্ষ। স্পেস-কম্যাণ্ডারের জয় হোক।'

ওদের উচ্ছ্বাসটা একটু কমলে পর জা-রো প্রস্তাব করল,—'এবার তাহ'লে অতি বুদ্ধিমান মার্কোসাপলানদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করুন স্পেস-কম্যাণ্ডার।'

খসখসে গলায় হেসে উঠে জোম্বালজিয়া বলল,—'ওদের সঙ্গে দেখা হবে কি করে জা-রো?'

'তার মানে?'

'অন্ধকারে ওদের দেখব কি করে আমরা?'

'ওঃ হো, তা-ও তো বটে,···তা-ও তো বটে···' বলে আমতা আমতা করতে লাগলো জা-রো। কথাটা ওর মনেই আসেনি।

মার্কোসাপলানদের সঙ্গে দেখা না হবার সম্ভাবনায় একটু যেন দমে গেল সবাই।

হাত তুলে ওদের অভয় দিল ব্যোমব্রহ্ম, বলল,—'ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই, অন্ধকারে কিচ্ছু অসুবিধা হবে না তোমাদের। মহাকাশ-

যানে অন্ধকারে দেখবার উপযোগী বিশেষ ধরনের ইনফ্রারেড রশ্মিযুক্ত চশমা আছে। সেগুলো পরে নিলেই হলো। সেটা কোনো সমস্যাই নয়, আসল সমস্যা হচ্ছে—'

'—কী কী—' বলে চেঁচিয়ে উঠলো টিম্বালটিয়া আর জোম্বালজিয়া, নিষ্ফলা অভিযানের অভিশাপের হাত থেকে মুক্তি পাবার সম্ভাবনায় স্বাভাবিক গাম্ভীর্য হারিয়ে ফেলছিল ওরা, উৎসাহে আনন্দে একেবারে টগবগ করে ফুটছিল।

চিন্তিতভাবে ব্যোমব্রহ্ম বলল,—'এই মার্কোসাপলানরা যে কী ধরনের প্রাণী হতে পারে সে সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই নেই আমাদের। এদের দেহের গঠন, আচার-ব্যবহার, আকৃতি-প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুই জানি না আমরা। এরা হিংস্র না শান্ত, রাগী না ঠাণ্ডা, আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করবে না বন্ধুত্ব, তা-ও জানি না। শুধু এটুকু জানি যে এরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণী, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে খুবই উন্নত, আণবিক শক্তির রহস্যও অজ্ঞাত নয় তাদের কাছে। আমরা আছি সৌরজগৎ থেকে বহু দূরে, সেখান থেকে কোনো সাহায্যই আসতে পারবে না, আর এটা ওদেরই দেশ, হঠাৎ যদি শত্রুতা করে—' বলতে বলতে থেমে গেল ব্যোমব্রহ্ম।

টিম্বালটিয়া বলল,—'শত্রুতাই যদি করবে তাহলে সঙ্কেত পাঠিয়ে আমাদের ডেকে আনল কেন?'

একটু হেসে ব্যোমব্রহ্ম বলল,—'নিমন্ত্রণটা যে আমাদেরই করেছে তা-ই বা ধরে নিচ্ছ কেন টিম্বালটিয়া? এই বিশাল গ্যালাক্সীতে সৌরজগতটা তো ধূলিকণা মাত্র, আরও তো কোটি কোটি গ্রহ তারকা ছড়িয়ে আছে বিপুল মহাকাশে—'

'তা বটে, তা বটে—' বলে থেমে গেল বুদ্ধিমতী টিম্বালটিয়া।

ব্যোমব্রহ্ম আবার বলল,—'তবে আমরাও নিরস্ত্র নই। লক্ষ ভোল্ট্ বিদ্যুৎ ছুঁড়বার কামান আছে আমাদের সঙ্গে, তা ছাড়া আছে ভয়ঙ্কর সুপার ডিসইন্টিগ্রেটিং রশ্মি ছোঁড়ার কামান। ঐ রশ্মির সামনে পড়লে মুহূর্তের মধ্যে মহাজাগতিক ধূলিকণায় পরিণত হয়ে যাবে ওরা। বিপুল এনার্জি ছড়িয়ে পড়বে মহাকাশে।'

হঠাৎ বি-মা বলে উঠলো,—'আচ্ছা এমনও হতে পারে যে আমাদের এখানে টেনে এনে ফাঁদে ফেলবার জন্যই অমনি করে সঙ্কেত পাঠাচ্ছিল মার্কোসাপলানরা—'

চু-গা বলল,—'আমাদের ফাঁদে ফেলে ওদের লাভ?'

'সেটা অবশ্য এক্ষুণি বোঝা যাচ্ছে না।'

তর্ক জমে উঠলো, বহু আলোচনা হলো কিন্তু মূল সমস্যার মীমাংসা আর হলো না।

শেষটায় ব্যোমব্রহ্ম বলল,—'মার্কোসাপলানদের স্বরূপ জানবার জন্য একটা স্টাডি-টিম পাঠানো যাক। জানা দরকার ওরা ব্যাক্‌টেরিয়ার মতো ছোট্ট, না তিমির মতো প্রকাণ্ড, ওরা তরল না কঠিন না বায়বীয়, ওরা এককোষী প্রাণী, না বহু কোষী, ওদের তেজস্ক্রিয়তা আছে না নেই। এক সৌরজগতের দিকেই তাকিয়ে দেখ না,—মঙ্গলে আছে গাছ-মানুষ, বুধের প্রাণীর চ্যাপ্টা মুখ, চারটে চোখ, মাথায় অ্যানটেনা, শনির বলয়ের প্রাণীর নাকটা হাতির শুঁড়ের মতো লম্বা, শুক্রের প্রাণীর চোখ তার অ্যানটেনাতে, বৃহস্পতির প্রাণীর অ্যানটেনা দুটো সেকেলে জাহাজের মাস্তুলের মতোই মজবুত, ঐ অ্যানটেনা থেকে বিদ্যুৎ-স্ফুরণও হয়, পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, কানেও শোনে কম। কাজেই সৌরজগতের সীমানা থেকে বহুদূরের এই হলদে তারায় আমরা যে কী ধরনের প্রাণীর সাক্ষাৎ পাব তা কল্পনাও করতে পারছি না।'

সং-লা বলল,—'আমরা তো মোটে সাতজন। এর আর স্টাডি-টিম কী করবেন স্পেস-কম্যাণ্ডার? আমি বলি সবাই মিলেই যাই ওখানে, কারণ যাকেই স্টাডি-টিমে স্থান দেবেন না সে বেচারাই মনমরা হয়ে পড়ে থাকবে এখানে।'

বাকী অভিযাত্রী পাঁচজন সোৎসাহে সং-লার প্রস্তাবে সমর্থন জানালো। একটুখানি ভেবে নিয়ে বোমব্রহ্ম বলল,—'আচ্ছা, গ্রহমণ্ডল সরকারের সঙ্গে একবার পরামর্শ করে দেখি আগে। সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করা দরকার ওঁদের।'

শক্তিশালী বেতার-প্রেরক যন্ত্রটির কাছে গিয়ে বসলো ব্যোমব্রহ্ম।

কয়েকদিন পরে।

গ্রহমণ্ডল সরকারের অনুমতি পাওয়া গেছে। অভিযাত্রী বিজ্ঞানীরা বেজায় খুশী, সবাই যাত্রার তোড়জোড়ে ব্যস্ত। ব্যোমব্রহ্মও এ কয়টা দিন খুব ব্যস্ততার মধ্যে কাটিয়েছে, স্পেস-কম্যাণ্ডার সে, সব রকমের দায়-দায়িত্বই বিলি-ব্যবস্থা তাকেই করতে হবে।

যাত্রার আগের দিন মহাকাশযানের হলঘরে সভা বসালো ব্যোমব্রহ্ম শেষ আলোচনা সেরে ফেলবার জন্য।

সামান্য জলযোগের পর উঠে দাঁড়ালো ব্যোমব্রহ্ম, বলল,—'সবাই মনে রাখবেন যে আমরা একটা বিঘ্নসঙ্কুল অভিযানে রওনা হচ্ছি। ব্যক্তিগত ও দলগত নিরাপত্তার জন্য আমার নির্দেশগুলো অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন। আত্মরক্ষার জন্য সবাই বিশেষ স্পেস-স্যুট পরে থাকবেন। সঙ্গে নেবেন সুপার ডিস্ইন্টিগ্রেটিং রশ্মি ছোঁড়ার পিস্তল। পরস্পরের সঙ্গে এবং আমার সঙ্গে অডিওগ্রাফে যোগাযোগ করবেন। কোনো কিছুতেই আতঙ্কগ্রস্ত হবেন না।'

জা-রো বলল,—'আপনার সব নির্দেশই আমরা মেনে চলব স্পেস-কম্যাণ্ডার। কিন্তু মার্কোসাপলাসের অন্ধকার পিঠ তো এখান থেকে বহুদূর, বোধহয় পনেরো লক্ষ মাইল, কিসে চেপে যাবো আমরা? ট্যাঙ্ক-ট্যাক্সিতে চেপে যেতে কিন্তু বহু দিন লেগে যাবে।'

বি-মা বলল,—'তার চেয়ে মহাকাশযানটিকে তুলে নিয়ে হলদে তারার আলো-আঁধারের গোধূলি রেখার কাছে রাখলে কেমন হয়? অন্ধকারের রাজ্যটা কাছে হবে ওখান থেকে।'

মাথা নেড়ে ব্যোমব্রহ্ম বলল,—'না বি-মা, তা হয় না। মহাকাশযানের জ্বালানিতে হাত দিতে আমি চাই না? ফেরার পথেও তো নানা আপদ-বিপদ ঘটতে পারে। তা ছাড়া মহাকাশযানটি হলদে তারার দুপুর রোদের রেখায় আছে, বেশ নিরাপদ জায়গা। বৃষ্টিও কম এখানে। বেগতিক দেখলে ছুটে এসে চট করে মহাশূন্যে উঠে যেতে পারবো!'

টিম্বালটিয়া বলল,—'তা হ'লে কিসে চেপে যাবো আমরা স্পেস-কম্যাণ্ডার?'

'কেন, হেলিকপ্টার-টাক্সিতে চেপে। বোম্বালভিয়া বুদ্ধি করে একটা হেলিকপ্টার-ট্যাক্সিও যে পুরে দিয়েছে মহাকাশযানের খোলে। ঐ আকাশ-ট্যাক্সির গতিবেগ ঘণ্টায় দশ হাজার মাইল। সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই মার্কোসাপলানদের দেশে পৌঁছে দিতে পারবে আমাদের। উপযুক্ত খাবার-দাবার অস্ত্রশস্ত্র সহ আমাদের সাতজনকে বইবার মতো ক্ষমতাও আছে তার।'

'তা হ'লে রওনা হচ্ছেন কখন?'

'কাল দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পরেই। ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে নাও সবাই, ক'দিন বেশ খাটা-খাটুনি গেছে, এখন কম্‌প্লিট রেস্ট নেওয়া দরকার।'

হল ঘর থেকে সবাই নিজের নিজের শ্লিপিং চেম্বারে চলে গেল, ঘুম আনবার সঙ্গীতের রেকর্ড চালু করে দিল। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই ঘুমের অতলে তলিয়ে গেল সবাই।

জেগে রইলো শুধু স্পেস-কম্যাণ্ডার ব্যোমব্রহ্ম। রবট দুটির সাহায্যে আকাশ-ট্যাক্সি নামিয়ে খাবার-দাবার, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি বোঝাই করবার কাজে লেগে রইলো সে।

আকাশ-ট্যক্সিটা খুব বড়ো না হ'লেও ব্যোমব্রহ্ম ও অন্যান্য অভি-যাত্রীদের জায়গা হ'তে অসুবিধা হ'ল না। উৎসাহে, উদ্দীপনায় টগবগ ক'রে ফুটছিল অভিযাত্রী ছয় জন, মার্কোসাপলাসের অন্ধকার পিঠে পৌঁছে কী দেখবে তাই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করছিল নিজেদের মধ্যে।

ব্যোমব্রহ্ম সোজা গিয়ে বসল আকাশ-ট্যাক্সির কনট্রোল কেবিনে। তার সামনে ছিল সতর্কভাবে কমপিউট করা গতিপথের চার্ট, তার ওপর আর একবার চোখ বুলালো সে। তারপর আকাশ-ট্যাক্সির আণবিক ইঞ্জিন চালু ক'রে দিল।

ঘণ্টায় দশ হাজার মাইল বেগে বেশ নীচু দিয়ে উড়ছিল আকাশ-ট্যাক্সিটা। মঙ্গলের গাছ-মানুষ বি-মা জানলার ধারে বসে তার গ্রি

ডাইমেনশন্ মুভি ক্যামেরাটা চালু করে দিল, গোটা হলদে তারার অপূর্ব দৃশ্যাবলী তুলে নিয়ে সৌরজগতের রাজধানী কাঞ্চনজঙ্ঘাতে একটা ফিল্ম শো দেখাবে সে। অন্য সবাই চোখে দূরবীন এঁটে মার্কেসাপলাসকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। দেখতে লাগল তার পর্বতমালা, উষর মরু প্রান্তর, গভীর অরণ্যানী, প্রকাণ্ড নদী, হ্রদ, জলাভূমি আর বিশাল সমুদ্র। রক্ত-সূর্যের হলদে আলোয় সেই সমুদ্র যেন রহস্যময়।

পৃথিবীর কোনও একটা জায়গায় এক সময়ে ভোর হয়, বেলা বাড়ে, দুপুর হয়, বিকেল আর সন্ধ্যা, আর সব শেষে আসে তামসী রাত্রি। কিন্তু মার্কোসাপলাসের কোনও একটা জায়গায় সময় থাকে স্থির হয়ে। যেখানে দুপুর সেখানে সব সময়েই দুপুর, যেখানে ভোর সেখানে সব সময়েই ভোর, আবার যেখানে বিকাল বা সন্ধ্যা সেখানে সব সময়েই বিকেল বা সন্ধ্যা। মার্কোসাপলাসের একটা মেরু রক্ত-সূর্যের দিকে মুখ ক'রে তাকাবার জন্যই এমনটি হয়েছে। ব্যোমব্রহ্মর আকাশ-ট্যাক্সিটা রওনা হয়েছিল দুপুর অঞ্চল থেকে, যতই দূরে যাচ্ছিল, ততই রোদ কমে আসছিল, গাছগুলো দীর্ঘতর ছায়া ফেলছিল।

আশী হাজার মাইল পেরিয়ে তারা মার্কোসাপলাসের অপরাহ্ণ অঞ্চলে পৌঁছে গেল। এখানে জমাট এ্যামোনিয়ার মুকুট পরা বিশাল পর্বত-শৃঙ্গগুলি রক্ত-সূর্যের ম্লান আলোকে সোনার মতো চকচক করছিল। তাদের আকাশ-ছোঁয়া চূড়ার ওপর দিয়ে উড়ে যাবার জন্য আকাশ-ট্যাক্সিকে ছ'শ মাইল ওপরে উঠতে হ'ল।

হিমালয়ান রেঞ্জের-চেয়ে হাজার গুণ বড় বড় পর্বতমালা শেষ হতে হতে আলো আরও কমে এল। এতদূরে এসে রক্ত-সূর্যকে টকটকে লাল দেখাচ্ছিল, আকাশ ভরা তারার মালা মহাকাশের বুকে অপূর্ব সৌন্দর্যলোক সৃষ্টি করেছিল। গোধূলির সেই ম্লান আলোতে আরও হাজার কয়েক মাইল যাবার পরেই তারা আলো অন্ধকারের সীমা-রেখায় পৌঁছে গেল, তার এপারে ম্লান দিন আর ওপারে নিকষ কালো রাত্রি—অন্ধকার—নিঃসীম, নিরন্ধ্র, গা ছম্‌ছম্ করা।

সাঁৎ করে অন্ধকারের রাজ্যে ঢুকে গেল আকাশ-ট্যাক্সিটা। যাত্রীরা রোমাঞ্চিত হ'ল, টিম্বালটিয়া অস্ফুটস্বরে বলে উঠলো—'এইবার, এইবার ভেদ হবে অজানা সঙ্কেতের রহস্যটা, উঃ—কী—অন্ধকার ?'

অডিওস্কোপে ব্যোমব্রহ্মের আদেশ ভেসে এলো—'তোমরা সবাই বিশেষ ধরনের ইন্‌ফ্রা রেড রশ্মিযুক্ত চশমা পরে নাও। তা হ'লেই সব কিছু পরিষ্কারভাবে দেখতে পাবে, যদিও দেখবার বিশেষ কিছুই নেই, এখানকার টপোগ্রাফীও আলোকিত অংশেরই অনুরূপ, তবে গাছ-গাছড়া বলতে কিছুই নেই। নদী, হ্রদ, পাহাড় আর ধু-ধু প্রান্তর, সীমাহীন প্রান্তর।

সবাই চটপট বিশেষ চশমা পরে নিল, বাইরে তাকিয়ে দেখে ঝুঝল যে ব্যোমব্রহ্মের বর্ণনা একশো ভাগই খাঁটি। তবে তখনো হলদে তারার বুদ্ধিমান প্রাণীদের বাড়িঘর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

জা-রো-র সঙ্গে ছিল সুপার ইন্‌ফ্রা রেড রশ্মিযুক্ত ছোট মুভি ক্যামেরা যা দিয়ে গভীর অন্ধকারেও চমৎকার ফটো তোলা যায়। শনির বলয়ের বিজ্ঞানীদের বিশেষ আবিষ্কার ওটা। সেই ক্যামেরার সাহায্যে মার্কোসাপলাসের অন্ধকার পিঠের ফটো তুলতে লাগলো জা-রো। অন্য অভিযাত্রীরা, বিশেষ ক'রে মঙ্গলের গাছ মানুষ বি-মা খুবই হিংসে করতে লাগলো জা-রোকে।

আরও ঘণ্টা খানেক ওড়ার পরে চারিদিকে উত্তুঙ্গ পর্বতমালা পরি-বেষ্টিত একটা হাজার ক্রোশ ব্যাপী বিশাল সমতল প্রান্তরে এসে পড়ল ওদের আকাশ-ট্যাক্সিটা। অডিওস্কোপে চেঁচিয়ে উঠল ব্যোমব্রহ্ম,—'এসে পড়েছি, এসে পড়েছি, মার্কোসাপলানদের দেশে এসে পড়েছি।'

ব্যোমব্রহ্ম সহজে উত্তেজিত হয় না, তাই হঠাৎ তার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলো অভিযাত্রীরা। সং-লার একটু তন্দ্রাভাব হয়েছিল, চমকে চোখ মেলল সে। সবাই জানলা দিয়ে নীচের দিকে তাকালো। যা দেখল তা ছিল তাদের কল্পনারও অগোচর। গোটা প্রান্তরটা ছেয়ে আছে হাজার হাজার উঁচু উঁচু গম্বুজাকৃতি বাড়িতে। বাড়িগুলোর

বিচিত্র গঠন, তাদের সারা গা দিয়ে এক ধরনের তীব্র নীল আভা বার হচ্ছিল। বাড়িগুলি সমান দূরত্বের ব্যবধানে নিখুঁত জ্যামিতিক প্যাটার্ণে মাটির বুকে বসানো ছিল।

অডিওস্কোপে হুঁশিয়ারী জানালো ব্যোমব্রহ্ম—'সাবধান, আমরা কিন্তু মার্কেসোপলানদের একটা শহরে এসে পৌঁছেছি।'

চোখে বিশেষ ধরনের চশমা থাকায় ঘন অন্ধকারেও সব কিছু পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছিল অভিযাত্রীরা। কনট্রোল কেবিনে বসা ব্যোমব্রহ্ম আকাশ-ট্যাক্সির গতিবেগ কমিয়ে দিল, নীচের দিকে নেমে এলো খাড়াভাবে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রগুলো নিখুঁতভাবে কাজ করে যাচ্ছিল। অবজেক্ট ফাইণ্ডার যন্ত্রটি জানিয়ে দিল যে মার্কো-সাপলানদের বাড়িগুলো একশ মিটার লম্বা, নীচের দিকের ঘের পঁচাত্তর মিটার। এগুলো তৈরী হয়েছে এক অজ্ঞাত এ্যালয়ে। অন্য একটি যন্ত্র জানালো যে সামান্যতম তেজস্ক্রিয়তাও শুষে নেয় বাড়ির দেওয়ালগুলো। প্রত্যেকটি দেওয়ালে আছে কতকগুলো ফুটো, চার মিটার চওড়া ছয় মিটার লম্বা। প্রত্যেকটি বাড়ির মাথা গোল, তাতে টুপির মতো এক অজ্ঞাত যন্ত্র বসানো আছে।

দেখেশুনে তাক লেগে গেল ব্যোমব্রহ্মার, সঙ্গে সঙ্গে অডিওস্কোপে সব কথা জানিয়ে দিল পেছনে বসা অভিযাত্রীদের। ওদের মধ্যেও গভীর উত্তেজনা আর চাঞ্চল্য দেখা দিল। সত্যিই কি তারা হলদে তারার অতি বুদ্ধিমান প্রাণীদের শহরে এসে পড়েছে? অডিওস্কোপের ভেতর দিয়ে জীব-বিজ্ঞানী চু-গা বলে উঠলো—'মনে হচ্ছে যে আসল জায়গাতেই এসে পড়েছি আমরা, ঐ গম্বুজ মার্কা বাড়িগুলোতেই মার্কোসাপলানরা থাকে।

কয়েক হাজার মাইল ব্যাপী সেই গম্বুজ শহরের ওপর দিয়ে চক্কর মারতে লাগল আকাশ-ট্যাক্সিটা। একটু পরে ব্যোমব্রহ্ম লক্ষ্য করল যে শহরের কেন্দ্রের বাড়িটার আয়তন অন্য গম্বুজ বাড়ির চেয়ে সাত আট গুণ বড়, তার মাথায় পরানো টুপির মতো যন্ত্রটা আস্তে আস্তে ঘুরছে। তারই কাছে একটা ফাঁকা জায়গার ওপর আস্তে আস্তে

বিশাল পাখির মতো আকাশ-ট্যাক্সিটা নেমে পড়ল। তার আণবিক ইঞ্জিনের গর্জন স্তব্ধ হ'ল। অমনি নীচে নামবার জন্য উতলা হয়ে উঠলো অভিযাত্রীদল।

অডিওস্কোপে ব্যোমব্রহ্মের গম্ভীর ভরাট গলা ভেসে এলো,—'স্পেস-কম্যাণ্ডার বলছি। নামবার জন্য অত ব্যস্ত হ'য়ো না তোমরা। একে অজানা দেশ, তার ওপর চারদিক গভীর অন্ধকারে ঢাকা। এখানকার প্রাণীদের কারুর দেখা পাইনি এখন পর্যন্ত, ওরা আমাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে তা-ও জানা নেই। কাজেই সবাই এক সঙ্গে নেমে গিয়ে হঠাৎ কোনো বিপদে পড়লে বাঁচবার রাস্তা পাওয়া যাবে না।'

অসহিষ্ণু সুরে টিম্বালটিয়া বলল,—'আমরা এখন তাহলে কী করব স্পেস-কম্যাণ্ডার ?'

'কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে চারদিকে লক্ষ্য রাখো। অজানা গ্রহের প্রাণীদের দেখবার জন্য কেউ না কেউ নিশ্চয়ই আসবে।'

স্তব্ধ নীরবতার মধ্য দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল; কিন্তু গম্বুজ বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো না। শুধু তাদের তীব্র নীল আভা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

আস্তে আস্তে ব্যোমব্রহ্ম বলল,—'এই শহরের মার্কোসাপলানরা বোধহয় তাদের রাজধানীর সঙ্গে যোগাযোগ করছে আমাদের বিষয় নিয়ে—'

ব্যোমব্রহ্মার কথাটা অসম্পূর্ণই রয়ে গেল, হঠাৎ বাঁ দিকের একটি গম্বুজ বাড়ি সাঁ করে আকাশে উঠে গেল খাড়াভাবে, তারপর কাৎ হয়ে আরও গভীরতর অন্ধকারের দিকে মিলিয়ে গেল।

ব্যাপার দেখে সবাই তাজ্জব, এমন কি ব্যোমব্রহ্ম। অস্ফুট স্বরে জা-রো বলল,—'আমরা কি তবে মার্কোসাপলানদের হাওয়াই আড্ডায় এসে নামলাম স্পেস-কম্যাণ্ডার ?'

'আমার তা মনে হয় না জা-রো। আমার মনে হয় যে বিশেষ ধরনের এ্যালয়ে তৈরী এই নীলাভ গম্বুজ বাড়িগুলো বাড়ি-ই, তবে ফাউ-ণ্ডেশন না থাকার ফলে আকাশে উড়তেও কোনো অসুবিধা নেই।

হয়তো আমাদের সম্পর্কে যেসব তথ্য পেয়েছে তা নিয়ে কর্তৃপক্ষ স্থানীয় কারুর কাছে চলে গেল গম্বুজ বাড়ির লোকেরা।'

চু-গা বলল—'আমাদেরও কিঞ্চিৎ তথ্যানুসন্ধান করা দরকার স্পেস-কম্যাণ্ডার। ওদের হয়তো এমন কোনো যন্ত্র আছে যার সাহায্যে পুরু ইস্পাত প্রাচীরও কাঁচের মতো স্বচ্ছ দেখায়, সেই যন্ত্রের সাহায্যে গম্বুজ বাড়ির ভেতরে বসেই আমাদের দিব্বি দেখতে পাচ্ছে মার্কোসাপলানরা। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের কাছে সে ধরনের কোনো যন্ত্র নেই, গম্বুজ বাড়ির নীল আভার ওধারে কী আছে তা দেখতে পাচ্ছি না আমরা, অগত্যা পায়ে হেঁটে যাওয়া ছাড়া আর তো কোনো উপায় দেখছি না।'

যুক্তি আছে চু-গার বক্তব্যে, ব্যোমব্রহ্ম আর আপত্তি করল না, বলল—'তা হ'লে এক কাজ করো। তোমাদের মধ্যে দু'জন নেমে যাও নীচে। তোমাদের নামতে দেখলে ওরাও হয়তো গম্বুজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবে। যাবে খুব সাবধানে, সঙ্গে নাও বিদ্যুৎ পিস্তল আর সুপার ডিসইন্টিগ্রেটিং রশ্মি পিস্তল। দরকার হ'লেই ব্যবহার করবে। যদি মার্কোসাপলানদের দেখা পাও এবং তারা বন্ধুর মতো ব্যবহার করে তা হ'লে অডিওস্কোপে আমাদের জানাবে। তখন আরও দু'জন অভিযাত্রী নেমে যাবে। পারো তো গম্বুজ বাড়ির ভেতরটাও দেখে এসো। এটা বোধহয় সীমান্ত শহর। যদি অবস্থা অনুকূল হয় তা হ'লে ওদের কাউকে সঙ্গে নিয়ে ওদের রাজধানীতে যাবো।'

ব্যোমব্রহ্মর কথা মেনে নিল সবাই, কিন্তু মার্কোসাপলানদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের গৌরব কোন্ দু'জন পাবে তাই নিয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্ক সুরু হয়ে গেল ছয়জন অভিযাত্রীর মধ্যে। সবাই চায় আকাশ বিজয়ের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকতে। শেষটায়, বহু বাক-বিতণ্ডার পর প্রেমিক যুগল চু-গা আর জোম্বালজিয়াকেই সেই দুরূহ সম্মান দিতে রাজী হ'ল সবাই।

একমুখ হাসি নিয়ে উঠে দাঁড়ালো জোম্বালজিয়া।আর চু-গা, ব্যোমব্রহ্মকে বলল,—'আমরা তা হ'লে নামছি স্পেস-কম্যাণ্ডার—'

'ঠিক আছে। লিফ্‌ট দিয়ে নেমে যাও। খুব সাবধানে পা টিপে টিপে যাবে। বেশী দূরে গেলে কিন্তু এই চশমায় দেখতে পাব না তোমাদের। দরকার হলে আকাশ-ট্যাক্সির সার্চ লাইট ফোকাস করব।'

অন্ধকারে দেখবার চশমা পরে বিদ্যুৎ পিস্তল আর সুপার-ডিসইন্টিগ্রেটিং রশ্মি পিস্তল নিয়ে লিফ্‌টে করে নীচে নেমে গেল চু-গা আর জোম্বালজিয়া। ভয় যে একবারে করছিল না, তা নয়, তবু অজানাকে জানবার প্রচণ্ড আকর্ষণ সেই ভয়কে মাথা তুলতে দেয়নি। ওদের সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছিল বার বার। স্পেস-কম্যাণ্ডারের ওপর ওদের ছিল অগাধ বিশ্বাস, ওরা জানতো যে, যে-কোনো বিপদেই পড়ুক না কেন, ব্যোমব্রহ্ম ওদের বাঁচাবার পথ ঠিকই বার করে ফেলবে।

চু-গা আর জোম্বালজিয়া যে জায়গাটাতে নামল সে জায়গাটা একেবারে সমতল, মসৃণ। ঘাস বা ঐ জাতীয় কোনো উদ্ভিদ চোখে পড়ল না তাদের। এখানকার ভূ-প্রকৃতি হলদে তারার আলোকিত অংশের মতো নয়। নুড়ি, কাঁকড় বা পাথরের চিহ্নমাত্রও ছিল না সেখানে, মনে হচ্ছিল যে কেউ যেন একটু আগেই বৈদ্যুতিক সম্মার্জনী দিয়ে নিপুণভাবে ঝাড়ু দিয়ে গেছে জায়গাটিকে।

বিশেষ ধরনের চশমা চোখে থাকায় ঘন অন্ধকারেও দিনের মতোই সবকিছু দেখতে পাচ্ছিল ওরা। ফাঁকা জায়গাটুকুর প্রান্ত থেকে বিরাটকায় গম্বুজ-বাড়িগুলো যেন নীল শিখায় জ্বলছিল। চু-গার মনে হ'ল যে ঐ নীল শিখায় আলোই আছে, উত্তাপ নেই। বিশেষ ধরনের স্পেস-স্যুটে লাগানো তাপমান যন্ত্র লক্ষ্য করল সে। তাপমাত্রা জিরো ডিগ্রীর দেড়শ' ডিগ্রীর নীচে। স্পেস-স্যুট পরা না থাকলে ওরা জমেই যেত ঐ ঠাণ্ডায়।

হঠাৎ চু-গা-র হাত ধরে আকর্ষণ করল জোম্বালজিয়া, বাঁ-দিকের গম্বুজ বাড়িগুলো দেখালো। অবাক হয়ে চু-গা দেখল যে তাদের পা ফেলার তালে তালে কোনো কোনো গম্বুজ-বাড়ির চূড়া থেকে সবুজ ঝলক

দেখা যাচ্ছে। সতর্ক চোখে চারদিকে তাকালো ওরা, না, এখন পর্যন্ত কোনো মার্কোসাপলান ওদের দেখে বেরিয়ে আসে নি। এই চির অন্ধকার হিম শীতল দেশে কী ধরনের জীবের উদ্ভব হয়েছে সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি এখনো।

একবার পেছন দিকে তাকালো জোম্বালজিয়া। গাঢ় অন্ধকারে হেলিকপ্টারটা যেন হারিয়ে গেছে, শুধু কনট্রোল বোর্ডের লাল আলোটা রক্তচক্ষু খদ্যোতের মতো জ্বলছিল। গা ছমছম করে উঠলো তার। অডিওস্কোপে তাদের দশ মিনিটের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে দিল চু-গা। সব কথা শুনে ব্যোমব্রহ্ম বলল, 'সবচেয়ে কাছের গম্বুজ-বাড়িটার দিকে এগিয়ে যাও। খুব সাবধান।'

জোম্বালজিয়ার হাত ধরে সতর্ক পায়ে এগিয়ে গেল জীব-বিজ্ঞানী চু-গা। গম্বুজ-বাড়িটার কাছাকাছি যেতেই আপনা থেকে পা থেমে গেল ওদের। লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের ফলে যে সহজাত আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি ওদের অবচেতন মনে ঘুমিয়েছিল, তা যেন হঠাৎ অতিমাত্রায় সজাগ হয়ে উঠলো, থামিয়ে দিল দু'জনকে। শিরদাঁড়া দিয়ে বয়ে গেল একটা অস্বস্তিকর অনুভূতির কম্পন। দু'জনেই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল যে হালকা মেঘের মতো জমাট নীল বাষ্প গম্বুজ-বাড়িটার ফুটোগুলো দিয়ে গল গল করে বেরিয়ে আসছে। বাষ্প হ'লেও বাতাসের চেয়ে হালকা নয়, ভাসতে ভাসতে গম্বুজ-বাড়ির পায়ের কাছে মাটিতে নামলো সেই ঘন নীল জমাট বাষ্প, তারপর গড়াতে গড়াতে ওদের দিকে এগিয়ে এল।

উত্তেজিতভাবে চু-গার হাতটা শক্ত করে চেপে ধরল জোম্বালজিয়া, বলে উঠলো,—'ঐ নাকি মার্কোসাপলাসের অতি বুদ্ধিমান প্রাণী সঙ্কেতগুলো কি ওরাই পাঠিয়েছিল?'

জীব-বিজ্ঞানী চু-গা-ও কম অবাক হয়নি। যতই অদ্ভুত-দর্শন হোক, কোনো না কোনো রকমের প্রাণী দেখবার জন্যই মনের দিক থেকে প্রস্তুত ছিল সে, সবিস্ময়ে বলে উঠলো—'তরল হিলিয়ামের বোতল ফেটে গেলে যে রকম ঘন বাষ্পের মেঘ দেখা যায়, এরা তো

দেখছি ঠিক তেমনি দেখতে! তবে এদের ক্ষেত্রে রঙটা সাদা না হয়ে তীব্র নীল, এই যা তফাৎ। ঐ দেখ দেখ,—আরও চার পাঁচটা বাষ্পের কুণ্ডলী কখনো সঙ্কুচিত হচ্ছে, কখনো প্রসারিত হচ্ছে!'

জোম্বালজিয়া বলল—'এ আবার কী রকম প্রাণী, নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই? বেঢপ, বদখৎ দেখতে। হ্যাঁ, ওপরের দিকে যে দিকটাতে মাথা থাকবার কথা সে দিকটাতে টেনিস বলের মতো কয়েকটা চোখ দেখা যাচ্ছে, ঐ চোখ থেকেও তীব্র নীল আলো বেরিয়ে আসছে। নাক, কান, মুখ, পা বা এ্যানটেনা, কিছুই নেই। ঐ দেখ, সারা শরীর ছোট্ট হয়ে গেল প্রাণীটার, অক্টোপাসের মতো পাঁচ ছটা লিকলিকে অংশ বেরিয়ে আসছে, হাতও বলতে পারো, পা-ও বলতে পারো। তুমি অডিওস্কোপে সব কথা জানিয়ে দাও স্পেস-কম্যাণ্ডারকে। ওরা বেশ কাছে এসে গেছে।'

একটুও দেরী না করে চোখের সামনে যা যা দেখছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আকাশ-ট্যাক্সিতে বসে থাকা অভিযাত্রীদলকে জানিয়ে দিল চু-গা। ব্যোমব্রহ্ম বলল—'সার্চ-লাইটের দরকার হবে নাকি, চু-গা?

'না, এখন নয়। দরকার হ'লে বলব।'

বিচিত্র জীবগুলো আরও কাছে এলে পর আরও ভালভাবে ওদের দেখবার সুযোগ পেল চু-গা আর জোম্বালজিয়া। বাষ্পের কুণ্ডলীগুলো লম্বায় প্রায় এক মিটার হবে, মাঝখানে শরীরের বেড় প্রায় আশী সেন্টিমিটার। ওপরের দিকে ক্রমশ সরু হতে হতে ওটা প্রায় তিরিশ সেন্টিমিটারে দাঁড়িয়েছে, সেখানেই বেশ কয়েকটা টেনিস বলের মতো বড়ো গোল গোল চোখ যার ভেতর থেকে তীব্র নীল আলো বেরিয়ে আসছিল। প্রাণীটা তার ধড় থেকে ইচ্ছে মতো মাকড়শার ঠ্যাং-এর মতো সরু লিকলিকে হাত-পা বার করছিল বটে, কিন্তু এগিয়ে আসছিল মাটি থেকে সামান্য ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে। খুবই অনায়াস গতি তাদের। ওদের শরীর থেকে বেরিয়ে আসা নীল আলোটা জোনাকির আলোর মতোই তাপহীন বলে মনে হল চু-গার।

অডিওস্কোপে ফিসফিস করে বলে চলেছিল জোম্বালজিয়া—'ঘর

না বাস্তব বুঝতে পারছি না। এদের শরীরে কোনো হাড় আছে বলে মনে হচ্ছে না। কোনো কোনো জাতের ব্যাকটেরিয়াকে কোটি কোটি গুণ বড়ো করলে যেমন দেখাবে তেমনি দেখতে এরা।'

ব্যোমব্রহ্ম বলল,—'অসম্ভব নয় জোম্বালজিয়া। পৃথিবীতে ব্যাকটেরিয়ার কোনো পরিবর্তন হয়নি, কিন্তু এখানে হয়তো ব্যাকটেরিয়ারাই জটিল বিবর্তনের পথে লক্ষ কোটি বছর পরে অতি বুদ্ধিমান জাতিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে আমরা যে সৌরজগৎ থেকে ওদের জন্য বন্ধুত্ব ও প্রীতি বহন করে এনেছি এ কথাটা বোঝাবো কী ক'রে, বোঝাবো কী ক'রে যে আমরা ওদের শত্রু নই; বন্ধু!'

ওদের অডিওস্কোপের সেই কথাগুলো যেন মার্কোসাপলানরাও শুনতে পেল। থমকে থেমে পড়ল, তারপর তাদের মাকড়শার পায়ের মতো সরু হাতগুলো উঁচু করল। সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। আকারে তারা পঁচিশ-ত্রিশ মিলিমিটার বেড়ে গেল, হাত চোখও বেড়ে গেল সেই অনুপাতে। ওদের শরীর ও চোখ থেকে বিচ্ছুরিত সেই আশ্চর্য নীল আলোটা আরও দীপ্যমান হয়ে উঠল।

হাঁ হয়ে গেল জোম্বালজিয়া। চু-গা-ও কম অবাক হ'ল না, বলল, 'কী ব্যাপার! টেলিস্কোপিক জীব নাকি এই মার্কোসাপলানরা? আস্তে আস্তে কিভাবে আয়তন বাড়াচ্ছে দেখ!'

জোম্বালজিয়া আর দেরী করল না। অডিওস্কোপে মার্কোসাপলানদের এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের কথা জানিয়ে দিল স্পেস-কম্যাণ্ডারকে। ওরা যে ক্রমে ক্রমে খুব কাছাকাছি এসে পড়েছে এবং চারদিক থেকে ওদের ঘিরে ফেলবার চেষ্টা করছে সে কথাটা জানাতেও ভুলল না।

ব্যোমব্রহ্মের গম্ভীর ভরাট গলার নির্দেশ ভেসে এলো, কড়া নজর রাখো ওদের ওপর; ভয় পেও না, তোমাদের সঙ্গে অস্ত্র আছে, বিপদে পড়লে ব্যবহার করতে দ্বিধা কোরো না। গম্বুজ-বাড়ির সঙ্গে ওরা কোনো রকমের বেতার যোগাযোগ রাখছে কি না জানাও।'

ব্যোমব্রহ্মের কথা শেষ হতে না হতেই সামনের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল জোম্বালজিয়া, দেখল যে মার্কোসাপলানদের অদ্ভুত

প্রাণীদের চোখগুলো ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে, নীল আলোর ভেতরে বেগুনী ঝলক দেখা দিচ্ছে, নির্নিমেষ সম্মোহক দৃষ্টিতে তার দিকে ঠায় তাকিয়ে আছে। নিষ্ঠুর ক্রূরতায় ভরা সেই দৃষ্টির ঢেউগুলো তার গায়ের ওপর যেন আছড়ে পড়ছিল। ঐ দৃষ্টি যেন অদৃশ্য বন্ধনে তাকে বেঁধে ফেলছিল, তার মস্তিষ্কের ওপর চাপ দিচ্ছিল, সব রকমের প্রতিরোধ শক্তি ভেঙ্গে ফেলছিল।

ভয় পেয়ে চু-গার হাত চেপে ধরে জোম্বালজিয়া বলল, 'কী ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর দৃষ্টি ! আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসছে চু-গা, ওরা যেন টানছে,—হ্যাঁ, টানছে আমাকে।'

চু-গাও লক্ষ্য করেছিল ব্যাপারটা, বলল,—'হ্যাঁ ভয়ঙ্কর দৃষ্টিই বটে। ওদের চোখের নীল আলোর মধ্যে মাঝে মাঝে বেগুনী ঝলক দেখা দিচ্ছে, লক্ষ্য করেছ জোম্বালজিয়া ? আমার মনে হয় যে ওদের চোখ থেকে কোনো এক অজ্ঞাত রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে যা আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীকে অবশ করে দিতে পারে। আমাদের বিশেষ ধরনের রশ্মি নিরোধক স্পেস-স্যুট ভেদ করে ঐ অজ্ঞাত রশ্মি যেন আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রে আঘাত করতে চাইছে—'

'একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছ চু-গা ? আমরা যতবার অডিওস্কোপে কথা বলছি ততবারই ওরা লিকলিকে হাতগুলো উঁচু করে ধরছে এ্যানটেনার মতো ধ্বনি তরঙ্গকে শুষে নিতে চাইছে—'

'হ্যাঁ, আর তা করার সঙ্গে সঙ্গেই ওদের আয়তনও সামান্যভাবে বেড়ে যাচ্ছে, ওদের শরীর থেকে বিচ্ছুরিত নীল আভা তীব্রতর হচ্ছে।'

'ওদের সারা শরীরটাই কি টেলিস্কোপিক—চু-গা ?'

'না জোম্বালজিয়া, আমার তা মনে হয় না। টেলিস্কোপিক হ'লে লম্বা হবার সঙ্গে সঙ্গে সরু হয়ে যেতো ওরা, এভাবে চারিদিকে আয়তন সমান ভাবে বাড়ত না। জীব-বিজ্ঞানী হিসেবে এ কথা বলতে পারি যে দ্রুত দেহকোষ বিভাজন ছাড়া এ ধরনের ব্যাপার ঘটতে পারে না।'

ঠিক এই সময়ে মার্কোসাপন্দাসের অদ্ভুত প্রাণীদের দেখবার জন্য আর তাদের ফটো তুলবার জন্য আকাশ-ট্যাক্সির তীব্র সার্চ-লাইটটা এই

দিকে ফেলল ব্যোমব্রহ্ম। গভীর জমাট অন্ধকারকে ছিন্নভিন্ন করে সার্চ-লাইটের আলো ঝকঝকে বর্শা-ফলকের মতো গম্বুজ-বাড়িটাকে স্পর্শ করল। সঙ্গে সঙ্গে চু-গা আর জোম্বালজিয়ার কাছ থেকে ছয় ফুট দূরে এসে থেমে গেল মার্কোসাপলানরা। তারপর তাদের মধ্যে যেন একটা উৎসবের ছোঁয়া লাগলো, নাচের ভঙ্গীতে শূন্যে লাফাতে লাগল তারা, আলোক-ধারায় যেন স্নান করতে লাগল, আর তখনই সেই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা ঘটে গেল। আলোর স্পর্শ পেয়ে প্রত্যেকটি মার্কোসাপলানই যেন অতিমাত্রায় সজীব আর সক্রিয় হয়ে উঠলো। আয়তন বাড়তে বাড়তে প্রত্যেকেই দ্বিগুণ হয়ে গেল, আর ঠিক তখনই সমানে দুই অংশে ভাগ হয়ে যেতে লাগল তারা।

যেন আলোর গন্ধ পেয়েই, আরও শ'খানেক মার্কোসাপালন তাদের গম্বুজ-বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো, আর ঐভাবেই নাচতে নাচতে লাফাতে লাফাতে চু-গা আর জোম্বালজিরার দিকে ছুটে এলো। আসার মধ্যেও একটা ছন্দ ছিল, শিক্ষিত সৈন্য বাহিনীর মার্চ করে এগিয়ে আসার মতো। তখন চারদিকে শুধু তীব্র সাদা আলো, ঘন নীল আলোর অরণ্য আর স্বপ্ন-বিভীষিকার মতো অজানা অদ্ভুত প্রাণীর দ্রুত বিভাজন।

মেয়ে হ'লেও নারী প্রগতিতে শীর্ষস্থানীয় বুধ গ্রহের মেয়ে জোম্বালজিয়া, সাহস তার কম নয়, কিন্তু চারদিকের তীব্র ঐ নীল আভার জোয়ারে ভাসা জীবন্ত বিভীষিকা দেখে তার চ্যাপ্টা মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেল, আর এ্যানটেনা থেকে অজানা বিপদের সঙ্কেত পাচ্ছিল, মুখ ফিরিয়ে ফিস-ফিস করে চু-গাকে বলল, 'চলো চু-গা, আকাশ-ট্যাক্সিতে ফিরে যাই আমরা। মার্কোসাপলানদের মতিগতি সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না। ঐ দেখ আর একটা গম্বুজ-বাড়ি পাখা ছাড়া পাখির মতো শূন্যে উড়ে যাচ্ছে। আমাদের বন্ধুত্বই যদি ওদের কাম্য, হতো তা হ'লে দু-চার জনই এগিয়ে আসতো, এভাবে পঙ্গপালের মতো শ'য়ে শ'য়ে ছুটে আসতো না। চল, পালাই আমরা পরে হয়তো এ সুযোগ আর থাকবে না।'

কিন্তু প্রেমিক হলেও চু-গা একজন জীব-বিজ্ঞানী, সৌরজগতের বাইরে গভীর মহাকাশে একটা অজানা তারায় জীবনের উদ্ভভ ঘটেছে, সেই প্রাণীদের সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান করবার এতবড় সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইলো না সে, বলল,—'আর একটু দেখে যাই জোম্বালজিয়া, কি করে এত দ্রুত ওদের দেহকোষ বিভাজন হচ্ছে নতুন নতুন প্রাণীর জন্ম হচ্ছে সে রহস্য ভেদ না করে কি করে ফিরে যাই বলো ? এ ধরনের বায়োলজিক্যাল রহস্যের অস্তিত্ব সম্পর্কেই কোনো ধারণা ছিল না আমার। দেখতে দেখতে সংখ্যায় বহু গুণ হয়ে যাচ্ছে ওরা। দেহকোষ বিভাজনের প্রধান উপকরণ পুষ্টি, সেই পুষ্টি ওরা আহরণ করছে কোত্থেকে ?

'তা জানি না, কিন্তু ওরা যে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল আমাদের আবার,—আবার সেই শরীর অবশ করা অনুভূতি, একটা অবসাদ-আচ্ছন্নতা গ্রাস করতে চাইছে আমাকে।'

জোম্বালজিয়ার কথা শেষ হবার আগেই অগ্রবর্তী মার্কোসাপলানদের মধ্য থেকে কুড়ি তিরিশটি প্রাণী ঘন হয়ে ঘিরে ধরল ওদের, কয়েকজন সুশৃঙ্খলভাবে ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো, মনোযোগের সঙ্গে ওদের দেখল, তারপর দু'জন মার্কোসাপলান হঠাৎ বিদ্যুৎ বেগে এগিয়ে এসে চু-গা আর জোম্বালজিয়ার পা দুটো অক্টোপাসের শুঁড়ের মতো হাত দিয়ে বেঁধে ফেলল, আর বাঁধা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ওদের হাতগুলো শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ঘটনাটা এমনই আকস্মিকভাবে ঘটে গেল যে চু-গা আর জোম্বালজিয়া ছুটে পালাবার কথা ভাবতেই পারল না।

আর্তনাদ করে উঠল জোম্বালজিয়া,—'উঃ, কী শক্তভাবেই না পা দুটো বেঁধেছে আমার, নড়তেও পারছি না !'

ম্রিয়মাণ চু-গা বলল,—'আমারও সেই অবস্থা জোম্বালজিয়া, তবে ওরা হাত দুটো যে বাঁধেনি এই রক্ষে, হাত বাঁধলে অস্ত্র ব্যবহার করবারও ক্ষমতা থাকতো না আমাদের।'

সার্চ-লাইটের আলোয়, স্টেরিওভিসোস্কোপে গোটা ব্যাপারটাই লক্ষ্য করেছিল ব্যোমব্রহ্ম আর তার সঙ্গীরা। ব্যোমব্রহ্মের মুখে আশঙ্কার

ছায়া পড়ল, অডিওভিসোস্কোপে বলে পাঠালো সে,—'এই তারার প্রাণীরা আমাদের শুভেচ্ছা মিশনকে বন্ধুভাবে নিতে পারল না, এটা খুবই দুঃখের বিষয়। আমরা ভেবেছিলাম যে ওদের সঙ্গে ওদের রাজধানীতে গিয়ে ওদের জীবন-রহস্য জানবো, গভীর মহাকাশে এই সুদূর হলদে তারায় কীভাবে জীবনের উদ্ভব হ'ল তা জানবো, কিন্তু তা আর হ'ল না। তোমাদের বন্দী করে ওরাই প্রথমে শত্রুতা করল, যদিও হাত না বেঁধে আগে পা দুটো বাঁধলো কেন তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ওরা অতি বুদ্ধিমান, তোমাদের সঙ্গে যে অস্ত্র আছে, এবং তা যে হাত দিয়েই ব্যবহার করা হয় তা বোঝা উচিত ছিল ওদের। কিংবা এরা অস্ত্রের ব্যবহার জানেই না। চোখ থেকে সম্মোহক রশ্মি বার করবার কায়দাটাই জানে শুধু। বিচিত্র নয়। তোমরা সময় থাকতে থাকতে পিস্তল তুলে নাও, বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট করে সামনের সারির কয়েকজনকে মেরে ফেলো, ছুরি দিয়ে পায়ের বাঁধন কেটে ফেলো, তারপর সুপার-ডিস-ইন্টিগ্রেটিং রশ্মি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পিছিয়ে, চলে এসো আকাশ-ট্যাক্সিতে। ওরা, যখন আমাদের বন্ধুত্ব চায় না, তখন ওদের ধ্বংস করলে কোনো ক্ষতি হবে না, বরং বাকী মার্কোসাপলানরা ভয় পেয়ে আমাদের সঙ্গে সন্ধি করতে চাইবে। আর দেরী কোরো না চু-গা, ছোঁড়ো বিদ্যুৎ-পিস্তল।'

স্পেসকম্যাণ্ডারের আদেশ শোনামাত্র আর একটুও দেরী না করে স্পেস স্যুটের বেল্ট্ থেকে বিদ্যুৎ-পিস্তল বার করে নিল চু-গা আর জোম্বালজিয়া; অবাক হয়ে লক্ষ্য করল যে মার্কোসাপলানরা একটুও বাধা দিল না তাদের।

সামনেই দাঁড়ানো মার্কোসাপলানদের ঘন ব্যূহ লক্ষ্য করে পঞ্চাশ মিলিওয়েভ বিদ্যুৎ তরঙ্গ নিক্ষেপ করল চু-গা আর জোম্বালজিয়া। ঐ পরিমাণ বিদ্যুৎ-তরঙ্গে অন্ততঃ পঞ্চাশজন মার্কোসাপল্যানের তাৎক্ষণিক মৃত্যু হবার কথা কিন্তু তার কিছুই হ'ল না। এক হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক শক বেমালুম হজম করে ফেলল ওরা। সঙ্গে সঙ্গে ওদের আয়তন বাড়তে বাড়তে দ্বিগুণ হয়ে গেল, আর তার পরেই দুভাগে

ভাগ হয়ে সংখ্যায় দু'শ হয়ে গেল ঐ বিচিত্র জীবেরা। পিস্তলের লক্ষ্যের সামনে আসবার জন্য ওদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল যেন। হতভম্ব হয়ে গেল জোম্বালজিয়া, চু-গা রিপোর্ট পাঠালো আকাশ ট্যাক্সিতে। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ পাঠালো ব্যোমব্রহ্ম—'হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক শকে ওদের কিছু হবে না, তোমরা আমাদের অমোঘ অস্ত্র ব্যবহার করো। সুপার ডিস-ইন্টিগ্রেটিং রশ্মি ছুঁড়বার পিস্তল তুলে নাও। প্রথমে একশ' গ্রাম রশ্মি ছুঁড়ে মারো সবচেয়ে ঘন লাইনে।'

সঙ্গে সঙ্গে স্পেস-সুট্যের পকেট থেকে রশ্মি-পিস্তল বার করে নিল চু-গা আর জোম্বালজিয়া, লক্ষ্য করল যে পিস্তলটা দেখামাত্র প্রবল উত্তেজনা দেখা দিয়েছে মার্কোসাপলানদের মধ্যে। জোম্বালজিয়া বলল—'চু-গা, —ওরা কি তাহলে বুঝতে পেরেছে যে ওদের ধ্বংস ঘনিয়ে আসছে, দেখ দেখ, কী সাংঘাতিকভাবে চঞ্চল হয়ে উঠেছে ওরা, আর আশ্চর্য, আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অস্ত্র দুটো কেড়ে নেবার জন্য একবারও চেষ্টা করছে না!'

রশ্মি পিস্তল তুলে মার্কোসাপলানদের ঘনতম সমাবেশে লক্ষ্য স্থির করতে করতে চু-গা বলল, 'সত্যি অদ্ভুত ওদের আচরণ।'

দু'জনে একই সঙ্গে ট্রিগার টানল।

ওরা জানে যে একশ' গ্রাম সুপার-ডিস্-ইন্টিগ্রেটিং রশ্মির আঘাতে যে কোনো প্রাণী তো বটেই, যে কোনো বস্তুও অণু-পরমাণুতে বিভাজিত হয়ে যায় চোখের পলকে। সেই বিভীষিকাময় দৃশ্যটি যাতে দেখতে না না হয় সেজন্য ট্রিগার টানবার সঙ্গে সঙ্গে পলকের জন্য তার চার চোখ বুজে ফেলল জোম্বালজিয়া, কিন্তু পরক্ষণেই চোখ খুলে যা দেখল তাতে তার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল।

মার্কোসাপলাসের ঐ অদ্ভুত প্রাণীরা সৌরজগতের সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র সুপার-ডিস্-ইন্টিগ্রেটিং রশ্মিও বেমালুম হজম করে ফেলেছে! শুধু তাই নয়, যে পাঁচশ মার্কোসাপলানদের শরীরে ঐ রশ্মি গিয়ে আঘাত করেছে তারা হঠাৎ অতিকায় হয়ে উঠেছে, প্রত্যেকেই ভেঙে দু'জন হ'ল, সেই দুই দু'জনও বাড়তে বাড়তে চারজন হয়ে গেল, সেই

চারজনও···ঠিক যেন একটা চেইন-রি অ্যাক্শান শুরু হয়ে গেল মার্কোসাপলানদের বংশ বৃদ্ধির ব্যাপারে।

'উঃ কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য !' শেষ অস্ত্র বিফল হওয়াতে বিলক্ষণ ভয় পেয়ে আর্তনাদ করে উঠলো বুধের মেয়ে জোম্বালজিয়া,—'ওরা ছিল মাত্র পাঁচশ জন, আমাদের রশ্মির আঘাতে নিশ্চিহ্ন না হয়ে দেখতে দেখতে হয়ে গেল হাজার দশেক !'

বিপরীত ব্যাপার দেখে চু-গা-ও বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিল, বিমর্ষভাবে বলল—'নিজের চোখে না দেখলে এই অসম্ভব দৃশ্য বিশ্বাসই করতাম না। পৃথিবীতে কয়েকটা জাতের ব্যাকটেরিয়া আছে, ভালো খাওয়ানো হ'লে যারা অবিশ্বাস্য গতিতে বংশবৃদ্ধি করে থাকে, এরাও তাদের চেয়ে কম যায় না দেখছি ! এখন উপায় ? এদের হাত থেকে মুক্তি পাবো কী করে ? স্পেস-কম্যাণ্ডার কি বাঁচাতে পারবেন আমাদের ?'

হেলিকপ্টারের কনট্রোল রুমে বসে সবই দেখতে পাচ্ছিল ব্যোমব্রহ্ম, অডিওস্কোপে শুনতে পাচ্ছিল ওদের কথা, বলল—'তোমরা হু'জন বসে পড়ো চু-গা আর জোম্বালজিয়া, তোমাদের মাথার ওপর দিয়ে এক লক্ষ ভোল্টের ইলেকটিক চার্জ ছুঁড়ে মারছি—'

এ্যাটমিক জেনারেটারের সাহায্যে বিদ্যুৎ কামানের মারফৎ এক লক্ষ ভোল্টের সাংঘাতিক বৈদ্যুতিক চার্জ ছুঁড়ে মারবার ব্যবস্থা হ'ল। একটা বোতামে আঙুল ছোঁয়ালো ব্যোমবহ্ম, নিঃশব্দে মৃত্যু উদ্গীরণ করল বিদ্যুৎ কামান। কিন্তু অমন সাক্ষাৎ মৃত্যুও ধ্বংস করতে পারল না মার্কোসাপলানদের, ওরা আরও বিরাট হয়ে উঠলো। তখন মনে হচ্ছিল যে হাজার হাজার তীব্র নীল আলার ঢেউ যেন উত্তাল হয়ে উঠেছে। একটা প্রকাণ্ড ঢেউ আকাশট্যাক্সির দিকে গড়িয়ে এলো।

ইতিমধ্যে ভয় পেয়ে আরও হু'বারে চারশ গ্রাম সুপার-ডিস-ইন্টিগ্রেটিং রশ্মি ছুঁড়ে মেরেছিল জোম্বালজিয়া। ঐ আঘাতে পঞ্চকোট পাহাড়ের বিশাল পাহাড়ও রেণু রেণু হয়ে অণু-পরমাণুতে বিশ্লিষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু ঐ আশ্চর্য প্রাণীরা ধ্বংস হবার পরিবর্তে নিজেরাই ছোটখাটো পাহাড়ে পরিণত হতে লাগল, তাদের প্রকাণ্ড বড় গোল চোখ থেকে ঘন ঘন

বেগুনী আগুন বার হতে লাগল। চু-গা আর জোম্বালজিয়াকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল কয়েকজন মার্কোসাপলান, তারপর অবলীলাক্রমে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে ওদের গম্বুজ-বাড়ির দিকে নিয়ে যেতে লাগল। স্পেস-কম্যাণ্ডারের কাছে অডিওস্কোপযোগে বিপদবার্তা পাঠালো চু-গা আর জোম্বালজিয়া।

কিন্তু ব্যোমব্রহ্ম তখন নিজেদেরকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। হাজার দশেক মার্কোসাপলান ততক্ষণে ঘিরে ফেলেছিল আকাশ-ট্যাক্সিটাকে, আকাশ-ট্যাক্সির মসৃণ গা বেয়ে উঠতে লাগল ওপরের ইঞ্জিন রুমের দিকে। হাজার হাজার অক্টোপাস হাতে আকাশ-ট্যাক্সিটা ধরে নাড়াতে লাগল। অভিযাত্রী চারজন জানলা দিয়ে সভয়-বিস্ময়ে চারদিকের নীল আভার অফুরন্ত ঢেউ দেখতে লাগল। হঠাৎ ওদেরও সর্বশরীর অবশ হয়ে এল, ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল টিম্বালটিয়া—'স্পেস-কম্যাণ্ডার, স্পেস-কম্যাণ্ডার,—শীগগির ওপরে তুলুন আকাশ-ট্যাক্সিটাকে। আমাদের বিশেষ স্পেস-স্যুটও মার্কোসাপলানদের স্নায়ুতন্ত্র অবশ করা বিকিরণ রশ্মিকে বেশীক্ষণ প্রতিহত করতে পারবে না।'

ব্যোমব্রহ্ম বলল—'কিন্তু চু-গা আর জোম্বালজিয়া? ওদের উদ্ধারের কি হবে?'

'আমাদেরও বন্দী করলে তো উদ্ধারের আশা একেবারেই থাকবে না স্পেস-কম্যাণ্ডার। বরঞ্চ আকাশে উঠলে ধীরে-সুস্থে একটা পরিকল্পনা করবার সুযোগ পাওয়া যাবে।'

যুক্তিপূর্ণ কথা। তাই আর দেরী করল না ব্যোমব্রহ্ম, সঙ্গে সঙ্গে আকাশ-ট্যাক্সির আণবিক শক্তি-চালিত ইঞ্জিন চালু করল। অভিযাত্রী-দের নিরাপদে গ্রহমণ্ডলে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব যে তারই? এক সেকেণ্ডের মধ্যে মহাশক্তিশালী আণবিক ইঞ্জিন চারটে চালু হ'ল। হেলিকপ্টারের শরীর কেঁপে কেঁপে উঠলো। পা দিয়ে রাডার-পেডাল ছুঁয়ে হুইল ব্রেক আছে কিনা দেখে নিল ব্যোমব্রহ্ম, তারপর পিচ্-কনট্রোল লিভার নীচের দিকে ঠেলে দিল, আণবিক জ্বালানী জ্বালবার

সুইচ্ অন করে স্টার্টারে আঙুল ছোঁয়ালো। ইঞ্জিনের নিয়মিত গভীর শব্দশৃঙ্খল শুনে নিঃসংশয় হয়ে রটর-ব্রেকের চাপ অপসারিত করল। এরপর পিচ্ কনট্রোলের থ্রটল ঘুরিয়ে দিল। কনট্রোল-কেবিনের বাইরে বিশাল রটর ব্লেডগুলো ঘুরতে লাগল। দেখতে দেখতে তাদের গতিবেগ বেড়ে গেল। কনট্রোল প্যানেলের মিটার দেখল ব্যোমব্রহ্ম, রটর ব্লেড যথোপযুক্ত স্পীড নিয়েছে। তখন চাকার ব্রেক অপসারিত করল সে। হেলিকপ্টারটা নড়ে উঠলো কিন্তু উড়ল না। হঠাৎ "জি" লোড মিটারে চোখ গেল ব্যোমব্রহ্মের, চমকে উঠলো সে। "জি" লোড তখন দেড় থেকে তিনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। হাতে পায়ে যেন মন খানেক ওজনের পাথর বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে এমনি অসম্ভব ভারী বলে মনে হচ্ছিল শরীরটাকে। নাক ফেটে রক্ত বেরিয়ে এলো তার।

টিম্বালটিয়া বলল—'ঐ বড় গম্বুজ-বাড়িটার মাথা থেকে একটা হলদে আলোর রেখা এসে পড়েছে আকাশ-ট্যাক্সির ওপরে। তাই আমাদের "জি" লোড্ বেড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে স্পেস-কম্যাণ্ডার।'

বি-মা এতক্ষণ ধরে নীরব দর্শক হয়েছিল, এবার বলল, 'জ্ঞানে বিজ্ঞানে অতি উন্নত বলে গর্ব করি আমরা তবু আজ পর্যন্ত "জি" লোডের রহস্য উদঘাটন করতে পারিনি। এই মার্কোসাপলানরা সেই দুরূহ রহস্য ভেদ করে আমাদের ওপরে টেক্কা দিয়েছে!'

হঠাৎ কাছাকাছি একটা গম্বুজ-বাড়ি থেকে গভীর সবুজ স্পার্কিং হ'ল। হেলিকপ্টারের ব্যাটারীর ভোল্টেজ ধপ্ করে নেমে গেল। মার্কোসাপ-লানরা আকাশ-ট্যাক্সির গা বেয়ে উঠে জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিতে লাগল। বেগতিক দেখে সুইচ্ অফ্ করে দিল ব্যোমব্রহ্ম।

অদ্ভুত, অভূতপূর্ব দৃশ্য ও ঘটনা দেখার বিহ্বলতা ক্রমে ক্রমে কেটে আসছিল, অভিযাত্রী বিজ্ঞানীদের ক্ষুরধার বুদ্ধি ও মেধা আত্মস্থ হচ্ছিল, আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রেরণায়, চু-গা ও জোম্বালজিয়ার দুঃখ-দুর্দশায় তাদের মস্তিস্ক অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠছিল। সবাই এগিয়ে এলো তাদের প্রিয় স্পেস-কম্যাণ্ডারকে সাহায্য করবার জন্য।

ওদিকে অডিওস্কোপে চু-গার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—'স্পেস-কম্যাণ্ডার, আপনারা আমার কথা শুনতে পারছেন কিনা জানি না, তবু বলছি—মার্কোসাপলানরা আমাদের ওদের শরীর থেকে বেরিয়ে আসা এক ধরনের তন্তু দিয়ে বেঁধে গম্বুজ-বাড়ির ভেতরে নিয়ে এসেছে। চারদিকে তাপবিহীন আলো, খুব উজ্জ্বল ; চোখ ধাঁধিয়ে যায়। যে হলটাতে আমাদের আনা হয়েছে তার প্যানেল বোর্ডে অসংখ্য যন্ত্র, সুইচ, কমপিউটার। দেখতে একেবারে অন্যরকম। আমাদের মহাকাশযানের একটা লাইট ফটোও দেখতে পাচ্ছি। ওরা আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে কী যেন বলতে চাইছে, বুঝতে পারছি না। একজন মার্কোসাপলান আমার বিদ্যুৎ পিস্তল আর সুপার ডিস্-ইন্টিগ্রেটিং রশ্মি পিস্তল কেড়ে নিয়ে খুলে দেখছে। আমাদের নিয়ে ওরা যে কী করবে তা ঠিক বুঝতে পারছি না, তবে জামাই আদরে রাখবে না নিশ্চয়ই, কারণ তাহলে আর হাত-পা সব বিশেষ তন্তু দিয়ে বেঁধে রাখতো না। ঘরের বাতাসে তুলোর আঁশের মতো কী যেন ভেসে বেড়াচ্ছে, ক্রমে সারা শরীর অবশ হয়ে আসছে, আপনারা আকাশ-ট্যাক্সি নিয়ে পালান এখান থেকে। দেরী হলে সব—'

খট্ করে একটা শব্দ হল। চু-গার কথা বন্ধ হয়ে গেল।

বুধ গ্রহের এ্যাসট্রো-ফিজিসিস্ট টিম্বালটিয়া এতক্ষণ ধরে দেখা তথ্যগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছিল। যা দেখেছে, যা ঘটেছে, আর যা শুনেছে তার একটা উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আছে, সেই ব্যাখ্যাটাই খুঁজে বেড়াচ্ছিল সে। হয়তো সেই ব্যাখ্যার সূত্র ধরেই এই বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারবে তারা। টিম্বালটিয়ার বৈজ্ঞানিক ভাবধারায় পুষ্ট সুশৃংখল মস্তিষ্ক এরই মধ্যে একটা কার্য-কারণ সূত্র খুঁজে পেয়েছিল, কিন্তু সেটা সৌরজগতের বৈজ্ঞানিক ধ্যান-ধারণার এতই বিপরীতমুখী যে মুখ ফুটে তা বলতে ইতস্ততঃ করছিল সে। কিন্তু অডিওস্কোপে চু-গা-র কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার পর আর স্থির থাকতে পারল না টিম্বালটিয়া। বলে উঠলো—'আমার মনে হচ্ছে যে এই সমস্ত অদ্ভুত আর অবিশ্বাস্য ব্যাপারগুলোর একটা যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পেয়েছি স্পেস-কম্যাণ্ডার!'

'শুনবেন ? খুবই অবাস্তব আর অসম্ভব বলে মনে হবে কিন্তু, শেষটায় আবার পাগল ঠাওরাবেন না আমাকে।'

'না না। তুমি বলো।' অকূল সমুদ্রে খড়কুটো ধরবার মনোভাব নিয়ে বলল ব্যোমব্রহ্ম,—'শুনতে তো আর ক্ষতি নেই কোনো !'

'তা অবশ্য নেই—' বলে অন্য তিনজন অভিযাত্রী বিজ্ঞানীর কৌতূহলে ভরা চোখে তাকালো টিস্বালটিয়া, তার অ্যানটেনাটা কাঁপতে লাগলো উত্তেজনায়, বলে উঠলো,—'আমার মনে হয় যে এই মার্কোসাপলানরা আসলে এনার্জিভুক প্রাণী।'

'এনার্জিভুক !' অভিযাত্রী তিনজন ব্যোমব্রহ্মের সঙ্গে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো—'সেকি ! তুমি কি বলছ টিস্বালটিয়া !'

'ঠিকই বলছি—' এবারে দৃঢ় প্রত্যয়ের স্বরে টিস্বালটিয়া বলল—'এরা যে শুধু এনার্জি শোষণ করেই বেঁচে থাকে এবং পুষ্ট হয় সে বিষয়ে আমার মনে আর কোনো সন্দেহ-সংশয়ই নেই। চোখের সামনে যা যা ঘটতে দেখছি তা থেকে এ ছাড়া অন্য কোনো সিদ্ধান্তে আসাই যায় না।'

অচিন্ত্যনীয় হলেও তার কথাটা সরাসরি উড়িয়ে দিল না ব্যোমব্রহ্ম। নানান অচেনা, অজানা গ্রহে ও তারায় পাড়ি দিয়েছে সে, সেসব অভিযানে এমন সব অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাকে যা সৌরজগতের প্রাণীদের কল্পনাতেও আসবে না। তাই সে বলল,—'তোমার কথাটাকে উড়িয়ে দিতে চাই না টিস্বালটিয়া, কিন্তু কোন্ কোন্ তথ্য থেকে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছ বল তো।'

'বলছি, শুনুন। আমি লক্ষ্য করেছি যে মার্কোসাপলানদের কাছাকাছি যে কোন রকমের এনার্জি,—তা যে শব্দই হোক, কি আলোই হোক, কি বিদ্যুৎই হোক কিংবা সুপার-ডিস্-ইন্টিগ্রেটিং রশ্মিই হোক,—উৎপন্ন হওয়া মাত্র ঐ মার্কোসাপলানরা পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে। যেভাবে ওরা অতিকায় হয়ে উঠেছিল তা থেকে এটুকুই বোঝা যায় যে ওদের দেহকোষের বিভাজন অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে হয়। বড় হতে হতে ওরা দুভাগ হয়ে দুটি প্রাণীর সৃষ্টি করছিল।

বিদ্যুৎ তরঙ্গে বা সুপার ডিস্-ইন্টিগ্রেটিং রশ্মিতে ওদের মৃত্যু না হবার একমাত্র কারণ এই যে ওগুলো মৃত্যু-রশ্মি না হয়ে ওদের পক্ষে খাদ্য রশ্মি হয়ে উঠেছে!'

টিম্বালটিয়ার ব্যাখ্যা শুনে ব্যোমব্রহ্ম ও অন্যান্য অভিযাত্রীরা চুপ করে রইল। স্বচক্ষে যা দেখেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে টিম্বালটিয়ার থিওরীটা বিশ্বাস্য বলেই মনে হল ওদের—যদি শুদ্ধ এনার্জির সাহায্যে শরীরের পুষ্টি সাধন করবার ব্যাপারটা ছিল তাদের সব ধ্যান-ধারনা ও অভিজ্ঞতার পরিপন্থী।

বাইরে মার্কোসাপলানরা আর অত বেশী উৎপাত করছিল না, কারণ ওরা জানে যে আকাশ-ট্যাক্সির আর উড়বার ক্ষমতা নেই। অতি-ভোজনের ফলে আর ক্রমান্বয়ে বংশবৃদ্ধি করবার ফলে ওরা যেন একটু নিস্তেজই হয়ে পড়েছিল। মাঝে মাঝে দু'চার জন মার্কোসাপলান তাদের ভাঁটার মতো চোখ দিয়ে জানলা পথে আকাশ-ট্যাক্সির ভেতরটা দেখছিল বৈজ্ঞানিক কৌতূহল মেটাবার জন্য।

টিম্বালটিয়া বলে চলল—'উদ্ভিদ জগতে সবুজ ক্লোরোফিল যেমন সূর্যের আলোর এনার্জির সাহায্যে জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত করে, মার্কোসাপলনারাও হয়তো তাদের দেহকোষের ঐ তীব্র নীল আভার সাহায্যে শরীরের ভেতরে শুয়ে নেওয়া এনার্জি থেকে ওদের খাদ্য প্রস্তুত করছে। এ কাজটা ওরা করছে খুবই দ্রুতবেগে। অবশ্য উপাদানগুলির এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মূল তথ্য জানতে হলে কয়েকটি জ্যান্ত মার্কোসাপলান চাই আমাদের।'

এতক্ষণ ধরে চুপ করে টিম্বালটিয়ার কথা শুনছিল ব্যোমব্রহ্ম, এবার বলল—'তাহলে তো মামুলী অস্ত্র প্রয়োগে ওদের কাবু করা যাবে না টিম্বালটিয়া, তাতে ওদের লোকসান না হয়ে লাভই হবে বরং। এখন এই ফাঁদ থেকে উদ্ধার পাবার উপায় কি?'

হঠাৎ অডিওস্কোপে জোম্বালজিয়ার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'স্পেস-কম্যাণ্ডার, স্পেস-কম্যাণ্ডার,—শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? আমাকে আর চু-পাকে ওরা একটা কাচের মতো স্বচ্ছ মেশিনে ভরেছে।

মেশিনটা অদ্ভুত দেখতে। এক্স-রে প্লেটের মতো একটা বিশাল প্লেটে আমাদের শরীরের আভ্যন্তরীণ অংশ,—ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী, ধমনী, শিরা মায় মস্তিষ্কের ছবি পর্যন্ত ফুটে উঠেছে ওখানে। আমরাও দিব্বি দেখতে পাচ্ছি। হয়তো সৌরমণ্ডলের প্রাণীর শরীরের রহস্য জানতে চাইছে মার্কোসাপলানের বিজ্ঞানীরা। আমাদের বাঁচাবার চেষ্টা না করে এক্ষুনি এই বিভীষিকাময় জায়গা ছেড়ে পালিয়ে যান আপনারা। এই হয়তো আমার শেষ বার্তা, কারণ চু-গা-র অডিও-স্কোপ কেড়ে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখছে ওরা, হয়তো এবারে আমার অডিওস্কোপটাও কেড়ে নেবে। বিদায় স্পেস-কম্যাণ্ডার, চিরবিদায় বন্ধু অভিযাত্রীদল আমা—'

হঠাৎ থেমে গেল জোম্বালজিয়ার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর। ব্যোমব্রহ্মের চোখের সামনে ফুটে উঠলো তার হাসিখুশী মুখখানা, স্বচ্ছ সুন্দর ব্যক্তিত্ব। কঠিন, ভ্রূকুটি কুটিল হয়ে উঠলো স্পেস-কম্যাণ্ডারের মুখ, দুই চোখ জ্বলতে লাগলো নিষ্ফল ক্রোধে। সে-ই তো এই অভিযানের নেতা, সবার শুভাশুভের দায়িত্ব যে একান্তভাবে তারই। কিন্তু কী-ই বা করতে পারে সে? সৌরমণ্ডলের শ্রেষ্ঠ আয়ুধই যে নিষ্ফল হয়ে গেল মার্কোসাপলানদের কাছে। তাহলে···তাহলে কিভাবে শায়েস্তা করা যায় এই শয়তানদের। কিভাবে···কিভাবে···

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা সম্ভাবনার কথা বিদ্যুৎচমকের মতো খেলে গেল ব্যোমব্রহ্মের মনে। উত্তেজনায় কেঁপে উঠলো তার শরীর। কী আশ্চর্য! একথা এতক্ষণ কেন মনে পড়েনি তার? এই মার্কোসাপলানদের শায়েস্তা করবার মৃত্যুবাণ যে তার তূণীরেই-আছে।

অতিরিক্ত "জি" লোডের জন্য ক্রমেই অবসন্ন হয়ে পড়েছিল ব্যোম ব্রহ্মের শরীর। হাত পা নাড়তেও ভীষণ কষ্ট, তার মনে হচ্ছিল যে প্রকাণ্ড এক "ভাইস্" দিয়ে কে যেন তাকে সীটের সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। তবু যা করবার তা চটপট করতেই হবে।

অডিওস্কোপে পেছনে বসা টিম্বালটিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করল

ব্যোমব্রহ্ম, বলল—টিম্বালটিয়া, এক্ষুনি কনট্রোল কেবিনে চলে এসো, মার্কোসাপলানদের খতম করবার খাসা একটা প্ল্যান আমার মাথায় এসেছে, কিন্তু একা পেরে উঠবো না, তোমার সহযোগিতা চাই। তাড়াতাড়ি এসো। মার্কোসাপলানরা আবার আমাদের আকাশ ট্যাক্সি আক্রমণ করবে বলে মনে হচ্ছে।'

হতাশার বিষণ্ণতায় আস্তে আস্তে তলিয়ে যাচ্ছিল টিম্বালটিয়া, সৌরজগতের অতি বুদ্ধিমান প্রাণীদের এই শোচনীয় অসহায়তা আর বরদাস্ত হচ্ছিল না তার, হাত পা কামড়াতে ইচ্ছে করছিল। ঠিক সেই সময়ে ব্যোমব্রহ্মের কথা কটি তার কানে যেন মধু ঢেলে দিল, নতুন আশার আলো জ্বলে উঠলো তার চার চোখে, তার এ্যানটেনা নড়তে লাগলো, বলল—'কী প্ল্যান স্পেস-কম্যাণ্ডার ?'

'অডিওস্কোপে বোলো না, কে জানে মার্কোসাপলানরা এরই মধ্যে আমাদের আন্তর্গ্রহ ভাষাটাকেও আয়ত্ত করে ফেলেছে কিনা, বুঝতে পারলে সতর্ক হয়ে যাবে। তুমি চলে এসো আমার কাছে।'

তিন চার ডবল "জি" লোডের বাধা কাটানো সহজ নয়। শরীর, হাত পা সব যেন লোহার মতো ভারী। বহু কষ্টে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে কোনো মতে কনট্রোল কেবিনে পৌঁছে গেল টিম্বালটিয়া। কয়েক মিনিট চোখ বন্ধ করে বসে রইলো, তার ঘড়ির মতো চ্যাপটা মুখে তখন যেন সিঁদুরের ছোপ লেগেছিল অতিরিক্ত পরিশ্রমে। একটু পরে চোখ খুলে টিম্বালটিয়া বলল—'কী আপনার প্ল্যান স্পেস-কম্যাণ্ডার ?'

'আমার প্ল্যান মৃত্যু-রশ্মি—' নাটকীয়ভাবে বলে উঠলো ব্যোমব্রহ্ম। মৃত্যু-রশ্মি ? সে কি।' চমকে উঠে টিম্বালটিয়া বলল।

'হ্যাঁ টিম্বালটিয়া, মৃত্যু-রশ্মি। কেন, তোমার কি মনে নেই যে এখানকার রক্ত-সূর্যের আলো বিশ্লেষণ করে গামা-রশ্মির চেয়েও লক্ষ গুণ বেশী শক্তিশালী মৃত্যুর-রশ্মির সন্ধান পেয়েছিলাম আমরা। ঐ রশ্মি সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোজোম নিমেষে ধ্বংস করে দেয়, কিন্তু প্রোটোপ্লাজমের পুষ্টি সাধন করে ?'

মনে পড়ল টিম্বালটিয়ার, বলল,—'হ্যাঁ, এক বিন্দু রক্তের ওপরে ঐ মৃত্যু-রশ্মি ফেলে ঐ ধরনের ফলই পেয়েছিলাম আমরা। চোখের পলকে সমস্ত রকমের জীবকোষ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু....'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল ব্যোমব্রহ্ম, বলল—'সেই মৃত্যু-রশ্মি মার্কোসাপলানদের দেহকোষ ধ্বংস করে ফেলে বলেই না এরা আলো থেকে অন্ধকারে স্বেচ্ছা-নির্বাসিত ?'

'কিন্তু সেটা তো আমাদের অনুমান মাত্র স্পেস-কম্যাণ্ডার। বিজ্ঞান সম্মত পরীক্ষা করে সে তথ্য তো আর যাচাই করে দেখা হয় নি। ওরা তো সম্পূর্ণ আলাদা কোনো কারণেও আলোর রাজ্য থেকে অন্ধকারে এসে বসবাস করতে পারে।'

'তা অবশ্য পারে। কিন্তু আমার মন বলছে যে আমার অনুমানই ঠিক।'

'কেন ?'

'কারণ এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কোনো কিছুই ধ্বংসের অধীন না হয়ে পারে না। এই মার্কোসাপলানরা যখন সৌরজগতের ভয়ঙ্কয় অস্ত্রগুলোও ব্যর্থ করে দিয়েছে তখন এরা এই এলাকার মৃত্যু-রশ্মিতে নিঃশেষ হয়ে যাবে। এটাই আমাদের শেষ আশা টিম্বালটিয়া। একবার পরীক্ষা করে দেখতে দোষ কি ?'

'দোষ অবশ্য কিছুই নেই। আমি বিজ্ঞানী, সব কিছুই পরীক্ষা করে যাচাই করে নেওয়াই আমার ধর্ম। কিন্তু কোথায় পাবেন সেই মৃত্যু-রশ্মি। সে তো রেখে এসেছেন মহাকাশযানে।'

'ও, জানো না বুঝি ?' হেসে উঠলো ব্যোমব্রহ্ম,—এক লক্ষ্য মিলি ওয়েভ্ মৃত্যু-রশ্মি সুপার-ডিস-ইন্টিগ্রেটিং রশ্মির খালি খোলে ভরে নিয়ে এসেছি যে আকাশ-ট্যাক্সিতে।'

আনন্দে নেচে উঠলো টিম্বালটিয়া। এই না হ'লে স্পেস-কম্যাণ্ডার ! সব দিকে নজর আছে তার ! বিপদের ঘন অন্ধকারে আলোর ক্ষীণ রেখা যেন দেখতে পেলো সে, সত্যিই মহান আপনি। কিন্তু কিভাবে ঐ মৃত্যু-রশ্মির প্রয়োগ করবেন বলুন তো ?'

'তা-ও আমি ঠিক করে ফেলেছি টিম্বালটিয়া। সুপার-ডিস-ইন্টিগ্রেটিং রশ্মি ছুঁড়বার পিস্তল আছে আমাদের কাছে—'

'তা আছে—'

'ঐ পিস্তলের চেম্বার খুলে সুপার ডিস্-ইন্টিগ্রেটিং রশ্মির আধারটা খুলে বার করে মৃত্যু-রশ্মির আধার ভরে নেব। ছুটি আধারই এক মাপের, কাজেই কোন অসুবিধা হবে না, তারপর ট্রিগার টানলেই—'

'বুঝেছি বুঝেছি,—ট্রিগার টানলেই সুপার-ডিস-ইন্টিগ্রেটিং রশ্মির বদলে এই মৃত্যু-রশ্মি বেরিয়ে আসবে। তাহলে আর দেরী করবেন না স্পেস-কম্যাণ্ডার, ঐ দেখুন গম্বুজ-বাড়িগুলো থেকে অসংখ্য মার্কোসাপলান গড়াতে গড়াতে এদিকেই আসছে।'

একবার সেদিকে তাকিয়েই অতিরিক্ত 'জি' লোড্ অগ্রাহ্য করে কনট্রোল প্যানেলের একটা চেম্বার খুলে তার ভেতর থেকে মৃত্যু-রশ্মি ভরা আধারগুলো বার করতে লাগল ব্যোমব্রহ্ম। টিম্বালটিয়াও বসে রইলো না, ক্ষিপ্রহাতে সুপার-ডিস-ইন্টিগ্রেটিং রশ্মি পিস্তলের ব্রীচ খুলে চেম্বার খালি করতে লাগলো সে, তারপর খালি চেম্বার মৃত্যু-রশ্মি ভরা আধার ঢুকিয়ে দিতে লাগল। ঐ বিশেষ ধরনের আধার থেকে কোনো রকম বিকিরণ হচ্ছিল না বলে ওদের কোনো বিপদেরও আশঙ্কা ছিল না।

কিছুক্ষণের মধ্যে দশটা পিস্তল তৈরী হয়ে গেল। তিন চার গুণ 'জি' লোডের মধ্যে থেকে ওটুকু কাজ করতেই হাঁপিয়ে উঠলো ছু'জন।

মৃত্যু-রশ্মি পিস্তল হাতে নিয়ে সেলুলিয়ামের স্বচ্ছ-কঠিন জানলা দিয়ে বাইরে তাকালো ব্যোমব্রহ্ম। চারিদিকে যেন তীব্র নীল আলোর সমুদ্র। হাজার হাজরে মার্কোসাপলান যেন এক ছুঃস্বপ্নের মতো ভেসে বেড়াচ্ছিল আকাশ-ট্যাক্সির আশেপাশে।

একটা বড় ঝাঁকের দিকে নিশানা করে মৃত্যু-রশ্মি ভরা পিস্তলের ট্রিগার টানল ব্যোমব্রহ্ম।

সঙ্গে সঙ্গে সেই অবিশ্বাস্য দৃশ্যটা দেখল অভিযাত্রী চারজন। মৃত্যু-রশ্মির ছোঁয়াতে হাজার খানেক মার্কোসাপলান চোখের পলকে লুটিয়ে

পড়ল মাটিতে, বাকী সবাই প্রাণ ভয়ে গভীর অন্ধকারের দিকে ছুটে পালাতে লাগলো।

কয়েক মিনিটের মধ্যে আকাশ-ট্যাক্সির ধারে কাছে একটিও জীবিত মার্কোসাপলান রইলো না।

মৃত্যু-রশ্মির এই ব্যাপক ধ্বংস-ক্ষমতা লক্ষ্য করে বিস্ময়ের আর সীমা রইল না ব্যোমব্রহ্মের। অন্যান্য অভিযাত্রীরাও অবাক হয়ে শূন্য মাঠের দিকে তাকিয়ে রইলো।

টিম্বালটিয়ার দিকে তাকিয়ে ব্যোমব্রহ্ম বলল,—'আমার অনুমানই ঠিক হল টিম্বালটিয়া। মার্কোসাপলানরা আর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আমাদের। শুধু দুঃখ এই যে আজানা তারায় এসে নিষ্ঠুর হত্যায় নিজের হাতটা কলুষিত করতে হল আমাকে।'

একটা নিশ্বাস ফেলে টিম্বালটিয়া বলল—'দুঃখ আমারও হচ্ছে স্পেস-কম্যাণ্ডার! আমরা এসেছিলাম গ্রহমণ্ডল সরকারের শুভেচ্ছার বাণী বহন করে, শান্তি ও মৈত্রীর পতাকা নিয়ে। কিন্তু মার্কোসাপলানরা আমাদের উদ্দেশ্য বুঝল না, আগেই আক্রমণ করে বসল।' আমরা যা কিছু করেছি তা শুধু নিছক আত্মরক্ষার জন্য।'

অডিওস্কোপে মুখ দিয়ে সং-লা বলল,—'এবার চু-গা আর জোম্বাল-জিয়াকে মুক্ত করে আনতে হবে স্পেস-কম্যাণ্ডার, আর দেরী করা ঠিক হবে না।'

'নিশ্চয়ই এক্ষুনি যাচ্ছি আমি'—বলে দাঁড়াতে গিয়ে অবাক হয়ে গেল ব্যোমব্রহ্ম। তিন চার গুণ "জি" লোড্ এরই মধ্যে কমে অর্ধেক হয়ে গেছে, চলাফেরা করতে কোনো কষ্টই নেই আর।

মৃত্যু-রশ্মি ভরা পিস্তল হাতে নিয়ে লিফ্টে চেপে আকাশ-ট্যাক্সি থেকে নীচে নেমে গেল ব্যোমব্রহ্ম।

কেউ কোথাও নেই। চারিদিকে শুধু মার্কোসাপলানদের মৃতদেহ। তীব্র নীল আভা এরই মধ্যে নিস্তেজ হয়ে এসেছিল। সাবধান সতর্ক পায়ে কাছের গম্বুজ-বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল ব্যোমব্রহ্ম। গম্বুজ-বাড়িটার ভেতরে নীল আলোটাও আর জ্বলছিল না না তখন, কিন্তু বহুদূরে নীল আলোর সমুদ্র দেখে ব্যোমব্রহ্ম বুঝল যে

মৃত্যু-রশ্মির ভয়ে সাময়িকভাবে পশ্চাদপসারণ করলেও একেবারে হাল ছেড়ে দেয়নি মহাবুদ্ধিমান মার্কোসাপলানরা। সংখ্যায় ওরা কোটি কোটি। এক লক্ষ মিলি ওয়েভ মৃত্যু-রশ্মি দিয়ে কতক্ষণ তাদের ঠেকিয়ে রাখতে পারবে সে? এমনও হতে পারে যে কোনো অজ্ঞাত বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় তাদের ওপর আরও বড়ো আঘাত হানবার জন্যই প্রস্তুত হচ্ছে মার্কোসাপলানরা। কাজেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চু-গা ও জোম্বালজিয়াকে উদ্ধার করে এই চির অন্ধকারের রাজ্য থেকে সরে পড়াই যুক্তিসঙ্গত।

গম্বুজ-বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ব্যোমব্রহ্ম। ওর আলো আস্তে আস্তে কমে আসছিল। হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই, গম্বুজ-বাড়িটা সাঁ করে খাড়াভাবে আকাশে উঠে গেল আর প্রায় সেই সঙ্গেই ব্যোম-ব্রহ্মের কাছেই মাটিতে ধুপ্ করে একটা শব্দ হল। তাকিয়ে দেখল ব্যোমব্রহ্ম।

চু-গা! তাঁর কাঁধে জোম্বালজিয়া। গম্বুজ-বাড়ির জানলা দিয়ে ঠিক সময় মতোই লাফিয়ে পড়েছে সে।

অত উঁচু থেকে পড়ে চু-গার পায়ে বেশ চোট লেগেছিল। টলতে টলতে যন্ত্রণা বিকৃত মুখে উঠে দাঁড়ালো সে, একটু দম নিয়ে বলল,—'কি ব্যাপার স্পেস-কম্যাণ্ডার? গম্বুজ-বাড়ির ওরা হঠাৎ হুড়দাড় করে ছুটে পালাল কেন? হঠাৎ দেখি আমরা একা। ভাগ্যিস আমার গায়ে দশটা মানুষের শক্তি, তাই ওদের সেই স্বচ্ছ অথচ অত্যন্ত কঠিন যন্ত্রের দেওয়াল ভেঙে বেরিয়ে পড়তে পেরেছি আমি। সেই আশ্চর্য ধাতুটার একটা টুকরোও নিয়ে এসেছি, এ্যানালিসিস করে দেখতে হবে।' বলে হাতের মুঠো খুলে এক টুকরো স্বচ্ছ, উজ্জ্বল ধাতুময় পাত দেখালো চু-গা।

সংক্ষেপে মৃত্যু-রশ্মির কথা তাদের জানালো ব্যোমব্রহ্ম। শুনে জোম্বালজিয়া বলল,—'তাই ওরা অমনভাবে ভয় পাওয়া খরগোসের মতো ছুটে পালালো! আমরা তো জীবনের আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম।'

দূরে দূরে বিরাট গম্বুজ-বাড়িগুলো দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। কোন অজানা রহস্য আছে তাদের ভেতরে? একটার ভেতরে ঢুকে দেখবে নাকি ব্যোমব্রহ্ম? কে যেন তার কানে কানে বলছিল,—'যাও অভিযাত্রী, ভেতরে ঢুকে দেখ। এই অন্ধকারের রাজ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সুবিপুল আয়োজন দেখে এসো। ওখানে যে ল্যাবরেটরী আছে তাতে তোমাদের কল্পনারও অগোচর সব যন্ত্র আর মেশিন আছে। যাও···যাও···

স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো এক পা দু' পা করে এগুতে লাগল ব্যোমব্রহ্ম। কে যেন অদৃশ্য আকর্ষণে গম্বুজ-বাড়িগুলোর দিকে টানছিল তাকে, প্রতি মুহূর্তেই সে টান প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠছিল।

হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো জোম্বালজিয়া—'চু-গা, শীগগীর আটকাও স্পেস-কম্যাণ্ডারকে, নইলে একটু পরেই মার্কোসাপলানদের খপ্পরে গিয়ে পড়বে সে।'

ছুটে এসে ব্যোমব্রহ্মের কপালের রগ ঘেঁষে হালকা ঘুষি মারল চু-গা। জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেল ব্যোমব্রহ্ম। দূর থেকে মার্কোসাপলান-দের সমুদ্র জোয়ারের জলের মতো এগিয়ে এলো, জোম্বালজিয়া মৃত্যু-রশ্মি ভরা পিস্তলটা তুলে নিল, এক শ' মিলি ওয়েভ মৃত্যু-রশ্মি উদ্গিরণ করল তার পিস্তল। কয়েক হাজার মার্কোসাপলানদের মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে পড়ে যেতে দেখা গেল, নীল আলোর সমুদ্র আবার পেছনে সরে গেল।

চু-গার বলিষ্ঠ হাত দুটো তুলে নিল অচেতন ব্যোমব্রহ্মের শরীরটা, তার পরেই সে আর জোম্বালজিয়া ছুটতে লাগল তাদের আকাশ-ট্যাক্সির দিকে। ছুটতে ছুটতেই জোম্বালজিয়া বলল,—'অত দূর থেকে কোনো উপায়ে ওরা স্পেস-কম্যাণ্ডারের স্নায়ুর উপরে প্রভাব বিস্তার করল কে জানে? আর, কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে আমরা দু'জনও ওদের সম্মোহনের খপ্পরে পড়ে যেতাম। উঃ, কী সাংঘাতিক প্রাণী ওরা?

চু-গা বলল,—'জ্যান্ত মার্কোসাপলান তো আর পেলাম না, দু'একটা

মস্ন মাকে সাপলানই তুলে নাও জোম্বালজিয়া। পরীক্ষা করে দেখব। ওদের দেহকোষ বিশ্লেষণ করে জানতে হবে কী প্রক্রিয়ায় শুধু ঐ নীল আলোর সাহায্যে এনার্জি থেকে খাদ্য উৎপাদন করে ওরা। সূর্যের আলো ছাড়া কী করে বেঁচে আছে ওরা। ওদের মস্তিষ্কের গঠন পরীক্ষা করে নিশ্চয়ই বহু অজ্ঞাত তথ্য জানতে পারব আমরা। এসব পরীক্ষায় যদি সফল হতে পারি তাহলে জীব-বিজ্ঞানে অনেক দূর এগিয়ে যাবো আমরা। এই আকাশ-ট্যাক্সির আশেপাশে বহু মার্কোসাপলানের মৃতদেহ ছড়িয়ে পড়ে আছে। দু' একটা তুলে নাও জোম্বালজিয়া।'

টুপ করে নীচু হয়ে দুটো মার্কোসাপলানের মৃতদেহ তুলে নিল জোম্বাল জিয়া, বলল,—'ঈস্, কী হালকা ? যেন তুলোর বস্তা, আর একটা তুলে নিচ্ছি।'

একটু পরে লিফ্‌টে চেপে আকাশ-ট্যাক্সির ভেতর ঢুকে গেল ওরা। অচেতন ব্যোমব্রহ্মকে চেয়ারে শুইয়ে দিল চু-গা। ওদের দু'জনকে বুকে জড়িয়ে ধরল অভিযাত্রী চারজন। আনন্দোৎসব শুরু হয়ে গেল মৃত্যুর মোহনা থেকে ফিরে আসা তিনজনকে নিয়ে। কয়েক মিনিট পরে ব্যোমব্রহ্ম চোখ পিট পিট করে তাকানো-মাত্র ওদের আনন্দের মাত্রা সীমাহীন হয়ে উঠলো।

হঠাৎ টিম্বালটিয়া চেঁচিয়ে উঠলো,—'ঐ, আবার এগিয়ে আসছে ওরা, আর দেরী নয়, এক্ষুনি পালাতে হবে এখান থেকে।' একবার তাকিয়ে কনট্রোল কেবিনে ঢুকলো ব্যোমব্রহ্ম। আর একবার আকাশ-ট্যাক্সির ইঞ্জিন চালু করবার চেষ্টা করল। এবার কোনো বাধা পেল না সে, অনায়াসে আকাশে উড়ল যন্ত্র-পাখিটা, এগিয়ে চলল আলোর রাজ্যের দিকে।

পেছনে পড়ে রইলো বিভীষিকাময় চির অন্ধকারের রাজ্য।

কয়েক টন দুষ্প্রাপ্য মৌলিক ধাতু, কয়েক কোটি মিলিওয়েভ মৃত্যু-রশ্মি, তিন রকমের মৌলিক এলিমেন্ট্, তিনটি মার্কোসাপলানের মৃতদেহ নিয়ে ব্যোমব্রহ্মর ফোটন চালিত মহাকাশযান হলদে তারা ছেড়ে সৌর-

জগতের পথে অনন্ত মহাকাশে ভেসে পড়ল। প্রায় আলোর গতিতে সতর্কভাবে কমপিউট-করা পথে নির্ভুলভাবে ছুটতে লাগলো। দেখতে দেখতে অদৃশ্য যবনিকার আড়ালে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল হলদে তারা আর রক্ত সূর্য।

কনট্রোল প্যানেলের সামনে অনেকক্ষণ বসে থেকে অসংখ্য সূক্ষ্ম যন্ত্র-গুলো নিখুঁতভাবে কাজ করছে দেখে নিশ্চিন্ত বোধ করছিল ব্যোমব্রহ্ম। মস্ত বড়ো দুর্ভাবনার হাত থেকে মুক্ত হবার ফলে খুব হালকা হয়ে গিয়েছিল তার মন। বার বার প্রতীক্ষা-ব্যাকুল বোম্বালভিয়ার চ্যাপ্টা মুখখানা ভেসে উঠছিল তার মনে। মনে পড়ছিল তার চোখের সপ্রেম দৃষ্টি।

মহাকাশযানের লাউঞ্জের স্ক্রীনে তখন ইনফ্রা-রেড্-রে মুভি ক্যামেরায় তোলা ফিল্ম দেখানো হচ্ছিল। তাদের অভিযানের সব চেয়ে বিপদ-সঙ্কুল অংশটি দেখতে দেখতে বারবার শিউরে উঠছিল অভিযাত্রী দল। একটি সোফায় হাত ধরাধরি করে পাশাপাশি বসেছিল চু-গা আর জোম্বালজিয়া। সেই বিপদ ঘন মুহূর্তে স্পেস-কম্যাণ্ডারের উপস্থিত বুদ্ধিই যে তাদের মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছিল সে কথা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করে নিল ওরা।

ফোটন মহাকাশযান এগিয়ে চলল সৌরজগতের দিকে।

—